সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • ফেব্রুয়ারি ২০১৫

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা

স্মৃতিতে পাটগ্রাম অনাথবন্ধু হাই স্কুল

গল্প : পথের মানুষ

অন্তর্গত ভাবনা ও মাটির ঘ্রাণময় চিত্রপ্রদর্শনী

একালের খাওয়া দাওয়া

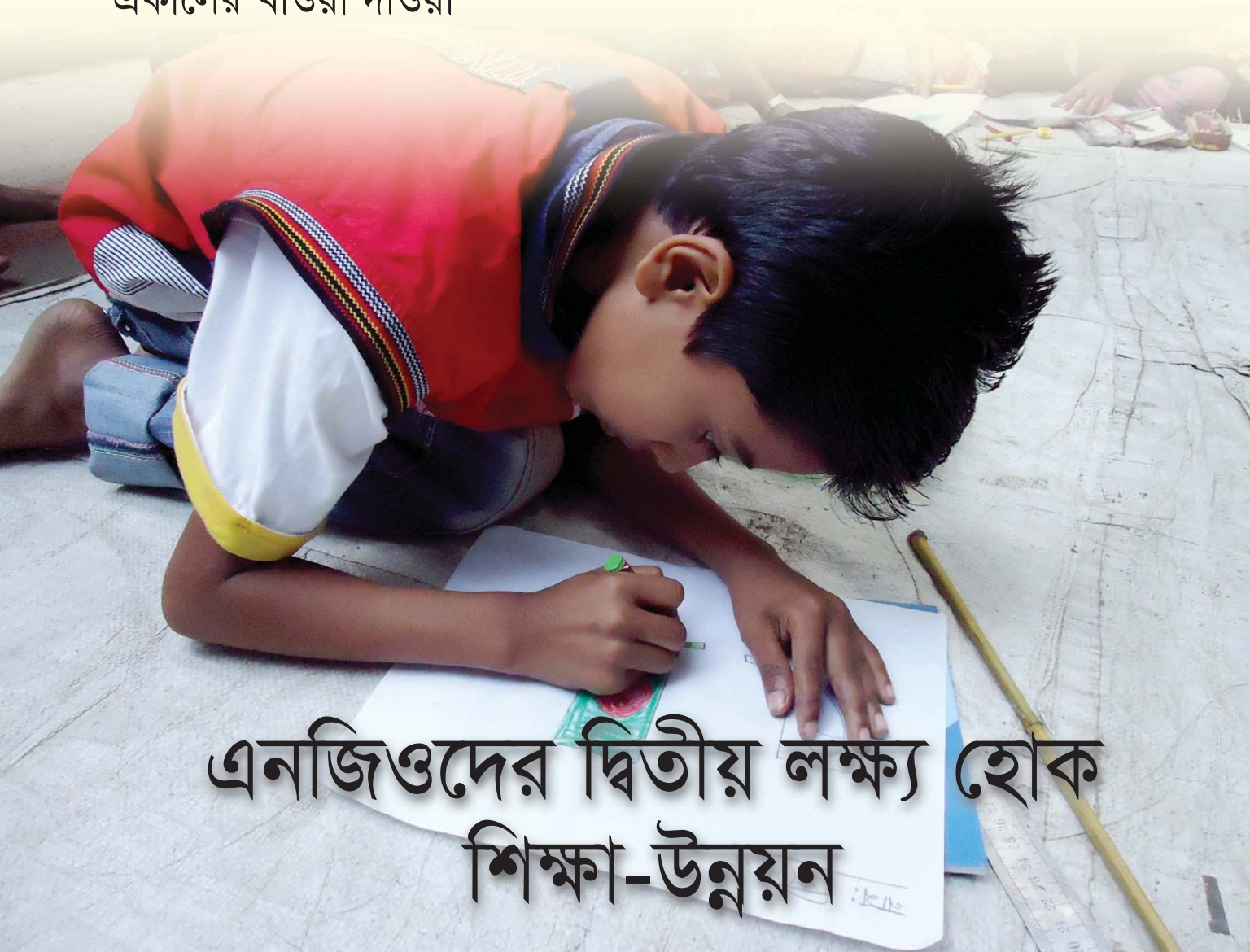

এনজিওদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হোক শিক্ষা-উন্নয়ন

শিক্ষালোক
সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ● ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

বাংলাদেশে এনজিওরা বহু বছর ধরে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তাদের অনেকের মূল কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্রঋণকে ঘিরে পরিচালিত হলেও নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এনজিওদের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কিন্তু আমরা মনে করি, সর্বজনীন শিক্ষা সার্বিক উন্নয়নের একটা অপরিহার্য শর্ত। দেশের অনেক এনজিওই শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখে থাকে এবং সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সফল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। এনজিওরা সমাজের একটি সচেতন অংশ বলে এক্ষেত্রে তারা আরো জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহ সফল করতে এর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

আমাদের এ বুলেটিনকে আকর্ষণীয় করতে আমরা কিছু বৈচিত্র্য যোগ করি, যার ছাপ চলতি সংখ্যায়ও পাওয়া যাবে। পাঠকের সহানুভূতি ও অংশগ্রহণ আমাদের পাথেয়।

সম্পাদক
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ম্যাস্-লাইন কমিউনিকেশনস্ লি.
ফোন : ৯১০৪৬৩৭
ই-মেইল : office@masslinebd.com

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৯১৪১৮৯১, ৯১৪১৮৯৩।
Email : cdipbd@yahoo.com, web: www.cdipbd.org

এনজিওদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হোক শিক্ষা-উন্নয়ন

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

মহান মুক্তিযুদ্ধের গোড়াতেই লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। নিরীহ এই মানুষেরা অবর্ণনীয় দুর্দশায় নিপতিত হয়ন। ভারতে এরা বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। তাদের দুর্দশাকে ঘিরে নানান সেবামূলক কার্যক্রম গড়ে ওঠে। বিভিন্ন বিদেশি ত্রাণপ্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে দেশীয় অনেক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

একাত্তরের ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হলে শরণার্থীরা দেশে ফিরতে শুরু করেন। তখন দেশের ভেতরে ত্রাণ কার্যক্রমের প্রয়োজন দেখা দেয়। দেশী সেবা উদ্যোগের যেসব অঙ্কুর ত্রাণশিবিরগুলোতে বেড়ে উঠেছিল তারা সহ বহু বিদেশি ত্রাণপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ভেতরে এসে ত্রাণ কার্যক্রম করতে থাকে। একটি বিধ্বস্ত দেশে নূতন সরকার দেশ গড়ার কাজে হাত দেয়। এর সাথে মানুষের মধ্যে নূতন দেশ গড়ে তোলার প্রেরণা জেগে উঠে। বহুজন বহুমাত্রায় কার্যক্রম শুরু করে।

ত্রাণ একটি বিশেষ সময়ের কাজ। সময়টি ফুরিয়ে গেলে ত্রাণ বরং মানুষের নিজস্ব উদ্যোগ এবং সমস্যা সমাধানের ইচ্ছাকে ভোতা করে দেয়। ত্রাণের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়। শুধুমাত্র ত্রাণকে লক্ষ্য স্থির করে যেসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের উষালগ্নে কার্যক্রম শুরু করে তারা কয়েক বছরের মধ্যেই কাজ গুটিয়ে ফেলে এবং অধিকাংশ বিদেশী প্রতিষ্ঠান নিজ দেশে ফিরে যায়। কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের 'সাময়িক ত্রাণকাজ'কে একটি 'দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন কাজ'-এ পরিবর্তন করে। উদাহরণ স্বরূপ ব্র্যাকের কথা বলা যায় যা ত্রাণশিবিরের কাজ থেকে গড়ে উঠে বাংলাদেশের ভেতরে এসে কিছুদিন ত্রাণকার্যক্রমের পর স্থায়ী 'উন্নয়ন সংগঠন' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে সংস্থাটি একটি মহীরূহ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে সারাদেশের আনাচে-কানাচে সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রও ত্রাণশিবির থেকে দেশে ফিরে একটি 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য মডেল' তৈরির প্রয়াস পায় এবং দেশের স্বাস্থ্য নীতিমালা তৈরিতে বিশেষ অবদান রাখে। এই স্বাস্থ্য নীতিমালা অন্যান্য দেশও উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে। এমন আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থায়ী রূপ নিতে মানুষের উদ্যোগের চেষ্টা নিরন্তর। আমাদের এ অঞ্চল বা দেশে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন, গান্ধীজির আশ্রম, আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম – এসব একধরনের উদ্যোগ। অন্যদিকে পল্লী মঙ্গল আন্দোলন, জনাব আখতার হামিদ খানের 'কুমিল্লা মডেল'-এর কার্যক্রম ইত্যাদি স্বাধীনতার আগেই স্থায়ী উন্নয়ন প্রচেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। কুমিল্লা মডেল ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিতে বিপ্লবী পরিবর্তন, জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়ন, সরকার ও জনগণকে কাছাকাছি আনা, স্থানীয় পরিকল্পনা, স্থানীয় সরকার, রাস্তা-ঘাট-সেচ, প্রশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর ফেলে যুগান্তকারী প্রভাব।

স্বাধীনতার ফল হিসাবে যে চেতনা উন্নয়নকে অগ্রসর করে নেয় তাতে সরকারী উদ্যোগের সাথে সাথে অন্যান্য নূতন চিন্তা উন্নয়ন যাত্রায় সঙ্গী হতে থাকে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যেই কিছু সফল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র 'নোবেল' বিজয়ী প্রতিষ্ঠান প্রফেসর মুহম্মদ ইউনূসের গড়া গ্রামীণ ব্যাংক। এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাব দেশ ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরে এবং বহু দেশ এর আঙ্গিকে দারিদ্র্য প্রতিহত করার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়াও বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অনেক প্রতিষ্ঠান অনেক অবদান রেখেছে। 'আশা' সারাদেশে অতি দ্রুত সময়ের ভেতর তার কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়ে একটি টেকসই প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়ায়। বহু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও 'প্রশিকা' সারাদেশে ছড়িয়েও দুর্ভাগ্যক্রমে টেকসই হতে পারেনি। তেমনি পারেনি 'স্বনির্ভর' নামের প্রতিষ্ঠানটি।

উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থায়ী রূপ নিতে মানুষের উদ্যোগের চেষ্টা নিরন্তর। আমাদের এ অঞ্চল বা দেশে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন, গান্ধীজির আশ্রম, আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম – এসব একধরনের উদ্যোগ। অন্যদিকে পল্লী মঙ্গল আন্দোলন, জনাব আখতার হামিদ খানের 'কুমিল্লা মডেল'-এর কার্যক্রম ইত্যাদি স্বাধীনতার আগেই স্থায়ী উন্নয়ন প্রচেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নানামুখী কার্যক্রম রয়েছে। এরমধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে ইউনূস-উদ্ভাবিত 'ক্ষুদ্রঋণ' কার্যক্রম। কার্যক্রমটি গ্রামের অধিকাংশ মানুষকে ছুঁয়ে দিয়েছে এবং শহুরে মানুষ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ মিলিয়ে সকলকে কোন না কোনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। গ্রামীণকে অনুসরণ করে কেবল বাংলাদেশেই গড়ে উঠেছে হাজারো প্রতিষ্ঠান। সরকার গড়ে তুলেছেন Microcredit Regulatory Authority (MRA)।

দেশের ভেতরে অধিকাংশ এনজিও যখন 'ক্ষুদ্রঋণ' কার্যক্রম শুরু করে, বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটা গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৩ সালের ভেতর প্রায় সোয়া তিন কোটি পরিবারে এই কার্যক্রম পৌঁছায় – যাদের অধিকাংশের বাস গ্রামীণ জনপদে। শুধুমাত্র ২০১৩ সালেই মোট ৫৭,০০০ কোটি টাকার 'ক্ষুদ্রঋণ' বিতরণ করা হয়েছে এবং ক্ষুদ্রঋণ স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫,০০০ কোটি টাকা। দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে গ্রামীণ পরিবারগুলোকে (যার বেশিরভাগ দরিদ্র) পুঁজি

সরবরাহ করায় ঐ পরিবারগুলোতে যে কোন না কোন রূপ অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

শিক্ষায় এনজিও-ভূমিকার নতুন মাত্রার প্রয়োজনীয়তা

এই সাফল্যের সাথে সাথে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সার্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্র্যাক প্রথম থেকেই গ্রামীণ মানুষের উন্নয়ন সচেতনতা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম করে আসছে। ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্র্যাক প্রাথমিক শিক্ষায় একটি ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। গ্রামাঞ্চলে 'ব্র্যাক স্কুল' একটি ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে এবং গ্রামীণ পরিবারগুলোর মাঝে ব্র্যাক স্কুলে তাদের বাচ্চাদের পাঠানোর একটি বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ব্র্যাক এখন মূলধারার প্রাথমিক স্কুল তৈরির কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্র্যাকের প্রণোদনায় বহু ছোট ছোট এনজিও অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সব এনজিও মিলে প্রাথমিক শিক্ষার এই কার্যক্রমটি একেবারে ছোট নয়। দেশের অন্তত ৫০০ এনজিও এরূপ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত।

এসব এনজিওর শিক্ষা কার্যক্রমে নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। কোন কোন এনজিও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে নিতে কার্যক্রম চালায়। কেউ কেউ কোনো শিশু বিশেষত দরিদ্র শিশুরা যেন স্কুল থেকে ঝরে না পড়ে তার জন্য কাজ করে। আবার অনেক এনজিও কর্মজীবী শিশুদের জন্য স্কুল চালায়। কেউ কেউ আদিবাসী শিশুদের জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় বই-পুস্তক প্রকাশ করে ও প্রাথমিক স্কুল চালায়। অবহেলিত, প্রান্তিক, দলিত জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য অনেকে কাজ করে। এসব স্কুলের ধরনেও বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন অনেক স্কুল গ্রামে কোন বাড়ির উঠান বা বরান্দায় বসে, শিক্ষক বা শিক্ষিকা অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে পারে, স্কুলের সময়সূচি সকাল বা বিকাল সুবিধা অনুযায়ী হয়, ইত্যাদি। কোন কোন এনজিও শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, কেউ আদৌ কিছু করে না। এর মধ্যে ব্র্যাকের স্বল্পমেয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণ উঁচুমানের বলে সুনাম অর্জন করেছে। অনেক এনজিও আবার কর্মমুখী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি চালায়। অধিকাংশ এনজিও তাদের স্কুলে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেউ কেউ স্কুলে মধ্যাহ্ন আহার চালু করেছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাও অনেকের দীর্ঘদিনের কার্যক্রম। বেশির ভাগ এনজিও স্কুল পরিচালনায় সামাজিক অংশগ্রহণ ও স্থানীয় চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়। সব এনজিও মিলে তারা এক বিরাট সংখ্যক প্যারা-টিচার তৈরি করেছে, যাদের পূর্ণ শক্তি এখনো কাজে লাগানো হয়নি। তাদের স্কুল ব্যবস্থাপনায়ও ভিন্নতা রয়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, এনজিওদের শিক্ষা কার্যক্রম দরিদ্র, প্রান্তিক, অবহেলিত, পশ্চাদপদ, সুবিধাবঞ্চিত, উন্নয়ন ধারার বাইরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিচালিত হয়েছে। এসব কার্যক্রম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা রয়েছে। আছে বহুরকম প্রকাশনা। এনজিওদের পরিচালিত এসব কাজ সরকারি শিক্ষা কার্যক্রমের তুলনায় সামান্য। তা সত্ত্বেও তাদের কার্যক্রমের এই বৈচিত্র্য, বিকল্প সন্ধান, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, নতুন উপায় উদ্ভাবন, এসবের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা এ থেকে অনেক কিছু নিতে পারে। সরকার তার শিক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারণেও এনজিওদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিতে পারে। মোট কথা, বাংলাদেশের শিক্ষা বিষয়ে এনজিওদের বৈচিত্র্যময় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে যাকে অবহেলা না করে আরো ভালভাবে কাজে লাগানো যায়।

এনজিওদের শিক্ষা কার্যক্রম দরিদ্র, প্রান্তিক, অবহেলিত, পশ্চাদপদ, সুবিধাবঞ্চিত, উন্নয়ন ধারার বাইরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিচালিত হয়েছে। এসব কার্যক্রম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা রয়েছে। আছে বহুরকম প্রকাশনা। এনজিওদের পরিচালিত এসব কাজ সরকারি শিক্ষা কার্যক্রমের তুলনায় সামান্য।

শিক্ষাতে এনজিওদের এই ভূমিকা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বেশিরভাগ সংস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে শিক্ষাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। অনেক এনজিওই মনে করে যে, শিক্ষা ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন অসম্ভব। দেখা যায়, বহু এনজিওর ক্ষেত্রে শিক্ষা কার্যক্রম তাদের বিবেচনায় দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

সামাজিক উন্নয়নে বিশেষত নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার সচেতনতা, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি সৃষ্টিতে সরকারের পাশাপাশি এনজিওরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এনজিওরা তাদের দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক, তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গণসংযোগ, সাংগঠনিক দক্ষতা ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগসমূহকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণে এনজিওদের একটি বিশেষ অবদান রাখার পর যদি এনজিওরা আজ শিক্ষাকে তাদের দেশব্যাপী সফলতার দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসাবে খুলে দেয় তবে সহযোগী সংস্থা হিসাবে সরকারের সাথে মিলে আগামী দশ বছরেরও কম সময়ের ভেতর বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতাকে নির্মূল করে দেওয়া সম্ভব। আসুন আমরা এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হই।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা

ইব্রাহীম সোবহান

বাংলাদেশে মোট স্কুলগামী শিশুর শতকরা ৯৪ ভাগ শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে যে সকল সমস্যা সৃষ্টি হয় তা হলো :

- শিশুর বিদ্যালয় পরিত্যাগের হার বেশি
- শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার
- দ্বি-খণ্ডিত সমাজ সৃষ্টি
- শিক্ষার গুণগতমান কম
- উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত
- বাণিজ্যভিত্তিক (কিন্ডারগার্টেন) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অপসংস্কৃতির আগমন
- দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা

উল্লেখিত সমস্যাগুলো সমাধানকল্পে ১৯৮৩ সন থেকে বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা (বিকেশি) পদ্ধতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গবেষণা করে তৈরি করা হয়েছে বয়স-উপযোগী বই, শিক্ষামূলক খেলনা ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল।

বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা (বিকেশি) পদ্ধতিতে প্রণীত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির অন্যান্য প্রি-স্কুল কর্মসূচি থেকে পৃথক কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে –

- নব উদ্ভাবিত পদ্ধতি প্রয়োগ
- আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় পাঠ
- লো-কস্ট পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি
- সরকারি/বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহজে বাস্তবায়ন
- নব উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে শিশুদের দিয়ে অশিক্ষিত মায়েদের নিরক্ষরতা মুক্ত করা
- জনসচেতনতার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণ দেখিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীটি চালু করা সম্ভব হয়নি। দেশের স্কুলগামী মোট শিশুর ৯৪% গ্রাম-গঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া করে। এই বিদ্যালয়ে শিশুর প্রাক-পাঠ ৬+ বয়সে ১ম শ্রেণী থেকে শুরু হয়।

অপরদিকে শহরে শিক্ষিত এবং অর্থবান অভিভাবকগণ শিশুর প্রাক-পাঠ ৬+ বয়সে ১ম শ্রেণী থেকে শুরু করতে একমত নন। তারা সৃষ্টি করছে বাণিজ্যভিত্তিক কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এইসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুরা প্রাক-পাঠ ৪+ বয়সে প্লে-গ্রুপ থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১২ বছরের শিক্ষার সুযোগ পায়। অন্যদিকে গ্রাম-গঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত ৯৪% শিশু ৬+ বয়সে ১ম শ্রেণী থেকে ১০ শ্রেণী পর্যন্ত মাত্র ১০ বছর শিক্ষা লাভের পর ১২ বছর শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত শিশুদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। ফলে অর্থবান সুবিধাভোগী ১২ বছর শিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত শিশুদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে পারে না।

আন্তর্জাতিকভাবেও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক শিক্ষার সময়সূচি প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীতে যথাক্রমে ৮৮৮ এবং ১০৫২ ঘণ্টা। অথচ বাংলাদেশে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীতে যথাক্রমে মাত্র ৪৪৪ এবং ৭১৫ ঘণ্টা। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক শিক্ষা সময়সূচি হিসেবে যা খুবই কম।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার (শিশু শ্রেণী) কোনো স্বীকৃতি নেই বা কোনো শ্রেণী নেই।* আর যারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করেন তাঁরা শুধু শিশুর ভাষাগত দিকটাই বিবেচনায় এনে থাকেন।

মূলত ৪+ থেকে ৫+ বয়সকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়স বলে ধরে নেয়া হয়। এই বয়স শিশু বিকাশের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শুধু শিশুর ভাষাগত দিকটাই বেশি বিবেচনায় আনাটা যথার্থ নয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বিকেশি পদ্ধতিতে এই বয়সের (৪+ থেকে ৫+) শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে যে ৭টি বিষয়কে চিহ্নিত করে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে, সেই ৭টি বিষয়/বৈশিষ্ট্যকে সম্পৃক্ত করে শিশু শ্রেণীর/ভিত্তি শ্রেণীর জন্য তৈরি করা হয়েছে আনন্দদায়ক একটি পাঠ্যসূচি। আর সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হলো –

- পরিবেশ সচেতনতা (Environmental Awareness)
- বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা (Cognitive Competency)
- ভাষাগত যোগ্যতা (Language Competency)
- সামাজিকীকরণ (Socialization)
- সৃজনশীলতা (Creativity)
- সংবেদনশীলতা (Sensibility)
- সাংস্কৃতিক বিকাশ (Cultural Awareness)

উল্লেখিত বিষয়/বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া একটি শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানো যায় না। এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে উপ-বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন: বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - ক. মনোযোগ, খ. পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং গ. স্মৃতি। এভাবে প্রতিটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যর উপ-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে এর যোগ্যতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। রচনা করা হয়ছে সহজ ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে বই।

সদ্যপ্রয়াত লেখক ইব্রাহীম সোবহান বাংলাদেশে 'বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি'র প্রবক্তা ও এ বিষয়ক একটি গ্রন্থের প্রণেতা।

* ২০১১ সাল থেকে সরকারি প্রাথমিক স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে।

পাটগ্রাম অনাথবন্ধু হাই স্কুল

স্মৃতির কাঁটায় ছাওয়া আমাদের প্রিয় গুরুগৃহ

তারিকুজ্জামান

কি লিখব, কেমন করে কোথা থেকে কোন কথাই বা লিখবো। অসংখ্য স্মৃতির মেলা ভিড় করে আছে। এ বলে আমায় লেখ, ও বলে আমায় লেখ। আসলে লিখতে চাইলেই কি সব লেখা যায়? না লিখিয়েদের জন্যে এ এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। অনেকটা 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' অবস্থা! তবুও স্মৃতির যন্ত্রণায় কলম হাতে তুলে নিতেই হলো।

ঐতিহ্যবাহী একটা বিদ্যাপীঠের জন্ম-শতবার্ষিকীকে সামনে রেখে এই প্রচেষ্টা। যে বিদ্যাপীঠটি হলো আমার প্রাণের স্পন্দন। মানুষ হওয়ার এক অনন্য গর্বের মন্দিরের মতো যাকে পেয়েছি। আর তাই পাটগ্রাম অনাথবন্ধু হাই স্কুল অনেকের এবং আমার কাছে এক অহংকার। এ অহংকারকে স্মৃতিতে লালন করে সবসময় বুক ফুলিয়ে গর্ববোধ করি - এমন একটি স্কুলে আমার মতো সাধারণের পড়ার সুযোগ হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বললে অত্যুক্তি হয় না। পুঁথিগত শিক্ষার শ্রেণীগত কোন ধাপ পেরুলো সেটিকেই সত্যায়িত করে শিক্ষাগত ধাপের সার্টিফিকেট নামক একটি কাগজ প্রদান যেন স্কুলগুলোর মূল লক্ষ্য।

আমরা যখন পাটগ্রাম স্কুলে শিক্ষারত কখনোই আমরা অনুভব করতে পারিনি যে, এখান থেকে একটা নিছক সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে এসেছি। আমরা কেন স্কুলে এসেছি, সেটি স্পষ্ট করে না বুঝতে পারলেও স্কুলে প্রবেশ করলেই আমাদের মধ্যে অন্যরকম এক অনুভূতি জেগে উঠতো। প্রকৃত অর্থে আমাদের বিদ্যাপীঠটি ছিল প্রাণ-প্রাচুর্যের সমাহার। এ যেন সেই প্রাচীন ভারতের একটি গুরুগৃহ। প্রকৃত মানুষ হতে গেলে যা কিছু প্রয়োজন তার প্রায় সকল কিছুরই প্রাচুর্য দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল আমাদের প্রিয় শিক্ষাঙ্গনটি।

পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা, নিয়ম-শৃঙ্খলা অর্জন, সামাজিক-মানবিক মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, দেশাত্মবোধের চর্চার পাশপাশি বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র স্বার্থ, চাওয়া-পওয়ার মোহ ত্যাগের বোধেও আমরা জাগরিত হয়েছি। অনেকটা প্রকৃতির মধ্যে থেকে যেন পাওয়া। যা আমাদের অজান্তেই ঘটে গেছে। শিক্ষাঙ্গন যে শুধু পুঁথিগত শিক্ষা অর্জনের জায়গা নয়, প্রকৃত মানুষ গড়ার কারখানা সেদিক দিয়ে পাটগ্রাম স্কুলকে আদর্শ স্কুল না বললে তাকে খাটো করাই হয়। জন্মের পর থেকে স্কুলটি এ পর্যন্ত তিনবার স্থানান্তরিত হয়েছে প্রমত্তা পদ্মার ভাঙ্গনের কবলে পড়ে।

শিক্ষা বলতে আমরা পুঁথিগত বিদ্যাকে বুঝে থাকি। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা হলো মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রামের অভিজ্ঞতার নিঃসরিত রূপ। প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষের সামনে উৎপাদনের বিকল্প ছিল না।

উৎপাদন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষকে নিরন্তর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন কলাকৌশল (পদ্ধতি) রপ্ত করতে সাহায্য করে। পুরাতন পদ্ধতির মধ্যে থেকে জন্ম নেয় নতুন পদ্ধতির। মানুষের অজান্তেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে তার জ্ঞানের বিকাশ ঘটে থাকে। উৎপাদনের প্রয়োজনে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা ও তার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের আচার-আচরণ এবং ধ্যান-ধারণা পাল্টে যায়। অর্জন করে সে নতুন ধ্যান-ধারণার (জ্ঞান) ও জীবন বোধের। এটাই হলো শিক্ষার প্রকৃত রূপ। পুঁথিগত বিদ্যা হলো তার জীবনবোধের ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র। বর্তমান শিক্ষাঙ্গনগুলোর বৈশিষ্ট্য বলতে যেয়ে প্রাসঙ্গিকতার জন্যে এ কথাগুলো উল্লেখ করতে হলো।

শুরুতেই আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে প্রকৃতির নির্মল পরিবেশে গুরুর জীবনাচরণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে জীবনাচরণ ও পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করতে হতো। এজন্যে গুরুরাও ছিলেন নির্মল চরিত্রের। বিধান এবং জীবনাচরণ কখনোই পরস্পর-বিরোধী হতো না। আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীদেরকেও প্রায় এভাবেই পেয়েছি। কিছু অভিজ্ঞতার স্মৃতি তুলে ধরলে বিষয়টি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

বুক দুরুদুরু অবস্থা নিয়ে প্রাথমিক স্কুল পেরিয়ে হাই স্কুলে প্রবেশ করি। বীরেন বাবু স্যার! বাপরে বাপ! তাঁর কড়া শাসনের কথা কিংবদন্তির মতো আমরা শুনে এসেছি। তিনি ক্লাস সেভেন থেকে পড়ান। আমরা তখন পড়ি ক্লাস সিক্সে। তারপরও আতংকগ্রস্ত থাকতাম। মনে মনে ভাবতাম স্যারের মুখোমুখি কখনো যেন হতে না হয়।

আমাদের ক্লাস টিচার ছিলেন অমূল্য স্যার। তিনি ছিলেন শান্ত এবং অমায়িক। তাঁকে কখনো ক্লাসে বেত হাতে করে আসতে দেখিনি। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনা। পড়া না পারলে বকা-ঝকা বা বেত চালিয়ে তাঁকে শাসন করতে দেখিনি। হাস্যরস, গল্প অথবা ব্যাঙ্গাত্মক কথা দিয়ে শাসন করতেন। যা বেত বা কটু বাক্যের মতো তেতো ছিল না। মিষ্টি আচরণ দিয়ে আমাদের মধ্যে অনুশোচনাবোধ জাগিয়ে তুলতেন। মানুষকে পরিবর্তনের জন্যে এতো সূক্ষ্ম পদ্ধতি (সাইকোলজিক্যাল) যিনি প্রয়োগ করতে পারেন সেই ব্যক্তিত্বের জ্ঞান ও জীবনবোধ কতো উঁচু মাপের তা সহজেই অনুমেয়। স্যার ছিলেন সেই মাপের একজন গুরু।

মতিন স্যার পড়াতেন ইংরেজি। ভীষন কড়া মেজাজের। বেত একটি সাথে থাকলেও প্রয়োগ করতেন একান্ত বাধ্য হয়ে। তবে তার কড়া কড়া শব্দ প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই বেত প্রয়োগের কাজটি পুষিয়ে নিতেন। তাঁর ইংরেজি বলার উচ্চারণ ভঙ্গি এবং গলার চাপা ভরাট ও তীক্ষ্ণ উচ্চারণে উপলব্ধি হতো তাঁর ক্লাসে ফাঁকি দেয়া চলবে না।

ক্লাস সিক্সে অংক করাতেন অহেদ আলী স্যার। তাঁকে রাগী মনে হতো। যথেষ্ট বেত চালাতে পারতেন। একটি অংক বারবার বোঝাতে বিরক্তি বোধ করতেন না। হঠাৎ করে আমরা একজন নতুন স্যার পেয়ে গেলাম। সেদিন ছিল ক্লাসে ইংরেজি গ্রামারের ইনডেফিনিট টেন্সের চ্যাপ্টারটি। স্যার বলে উঠলেন, তোমরা কি শুনেছো 'তেছ, তেছি, তেছে আছে; ঠাকুর দাদা নাচে।' স্যারের কথা শুনে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। হেসে বললেন, তোমাদেরকে টেন্স পড়াচ্ছিলাম। যদি দেখ ক্রিয়ার শেষে তেছে, তেছি, তেছো আছে; ভার্বের শেষে আইএনজি বসে এবং কর্তার পরে এ্যাম, ইজ, আর-এর একটি হয়। এভাবে তিনি গ্রামারের প্রতিটি চ্যাপ্টার ছড়া সাজিয়ে নোট দিলেন। এরপর গ্রামার পড়তে এতো আনন্দ আর কখনই পাইনি এবং কঠিন বলেও মনে হয়নি।

ক্লাস সেভেনে উঠে বীরেন বাবু স্যারের মুখোমুখি হতেই হলো। একটি নয় দু-দুটি সাবজেক্ট। বাংলা এবং ইংরেজি গ্রামার। আমাদের শ্রেণীতে বেশ কজন তুখোড় ছাত্র ছিল। এদের মধ্যে মোজাম্মেল, সোবহান, রফিক, সুনীল এবং আমেনা। স্যার ক্লাসে ঢুকলেই পুরো ক্লাস নিঃশব্দ হয়ে যেতো। হয়তো সূচ পড়লেও তার শব্দ পাওয়া তখন বিচিত্র ছিল না। রোল-কল করার সময়ে তিনি প্রতিটি ছাত্রের বহিরাঙ্গন এবং অন্তস্থল পর্যন্ত পড়ে নিতে পারতেন।

কেউ হয়তো চুল পরিপাটি করে ব্যাক ব্রাশ করেছে। আমাদের সময় চুলে তেল মেখে আসা রেওয়াজ ছিল। তখন স্টাইল করে চুল কাটা বা বড় চুল রাখা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। উত্তম কুমার স্টাইলে চুল আঁচড়ানোর লোভ আমাদের অনেকের থাকলেও স্কুলের ভয়ে মনের সখ মনেই থেকে যেতো। তবুও এর মধ্যে কারোও চুল বড় থাকলে তা ছিল নিতান্তই সাধারণভাবে। স্যার পড়া ধরলে কোনো ছাত্র হয়তো পারলো না। তাহলে শাস্তি তো তাকে একটা পেতেই হবে। নিল ডাউন এবং এক পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা অথবা বেত। কখনো কখনো ডাস্টার দিয়ে গালে ঘা। পড়া না পারা ছাত্র যদি ব্যাক ব্রাশ করা চুলের হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। স্যার এগিয়ে বেঞ্চের কাছে গিয়ে একটি আঙ্গুল দিয়ে চুল পেঁচিয়ে ধরে ডাস্টার দিয়ে গালে ঘা মারার সাথে সাথে ছড়া কেটে বলতেন, 'কেশ বিন্যাস করে এসেছো, পদ বিন্যাস করোনি।' কোনো কোনো সময় হুল ফুটিয়ে বলতেন 'এই যে বাঁশির সুর থাকবে না রে শ্যাম।'

প্রতিটি শিক্ষক একাধারে আমাদের গুরু, বন্ধু এবং অভিভাবক। সাত্তার স্যার, মণীষ স্যার, অনিলদা, ব্রজগোপাল স্যার, বিএসসি স্যার, প্রত্যেকেই আমাদের আগলে রেখে শিক্ষা প্রদান করেছেন। যা কখনই ভোলা যায় না।

শিক্ষকদের পড়ানোর পদ্ধতি তুলে ধরার জন্যে টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হলো। আসলে আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী ছিলেন বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যিনি যে বৈশিষ্ট্যের হোন না কেন প্রতিটি শিক্ষকের কাছে ছাত্র এবং স্কুল ছিল পরিবারের অংশের মতো। স্কুল যেন সংসার এবং ছাত্রগুলো তাদের সন্তান। সন্তানকে একাধারে শাসন করেছেন, আদর দিয়েছেন এবং ছাত্রদের চাওয়া-পাওয়া ও আবদার পূরণে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। কোনো ক্লাসে কোনো স্যারের কড়া শাসনে হয়তো মন ভারি হয়ে উঠেছে। পরের ক্লাসের স্যার অমায়িক আচরণ দিয়ে মন চাঙ্গা করে শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের নতুন উদ্যম তৈরী করে দিতেন। যতক্ষণ আমরা শিক্ষাঙ্গনে থেকেছি, আনন্দে ভরপুর থাকতাম। পিটি করাতেন শ্যাম মুন্সি স্যার। আসলে তার নাম ছিল সামসুদ্দিন আহাম্মেদ। কিন্তু তাঁকে সবাই শ্যাম মুন্সি স্যার বলতো। পিটি হতো বড় মাঠে। পিটি করানোর সময় স্যার কড়া মাড়ের ইস্ত্রি করা ইংলিশ হাফ প্যান্ট ও সাদা হাফহাতা সার্ট ইন করে পড়তেন। সাদা মোজা ও ক্যানভাসের সাদা জুতা পায়ে দিয়ে গলায় বাঁশি ঝুলিয়ে ফিটফাট হয়ে পিটি করাতেন। কখনো কখনো মাথায় একটা ক্যাপ থাকতো। ফুটবল খেলা হলে স্যার রেফারিও হতেন। স্যারের পিটি করার কথা এখনো মনে আছে। সেই আমলে পাটগ্রাম স্কুলে নিয়মিত স্কাউটিং ও সিভিল ডিফেন্সের চর্চা হতো।

প্রতিটি শিক্ষকের কাছে ছাত্র এবং স্কুল ছিল পরিবারের অংশের মতো। স্কুল যেন সংসার এবং ছাত্রগুলো তাদের সন্তান। সন্তানকে একাধারে শাসন করেছেন, আদর দিয়েছেন এবং ছাত্রদের চাওয়া-পাওয়া ও আবদার পূরণে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। কোনো ক্লাসে কোনো স্যারের কড়া শাসনে হয়তো মন ভারি হয়ে উঠেছে।

স্যার হিসাবে স্কুলের মধ্যমণি ছিলেন হাকিম স্যার। অদ্ভুত নেতৃত্বের গুণ তাঁর। তাঁর চলাফেরা এবং আচরণ দিয়ে এটা তিনি করতে পারতেন। প্রতিটি ছাত্রই তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতো। তিনি বেশ কবার স্কুল ত্যাগ করতে চাইলেও ছাত্রদের বাধার মুখে যেতে পারেননি। স্কুলের ছাত্র এবং প্রশাসনের শৃঙ্খলা, খেলাধুলা বা স্কুলের যে কোনো অনুষ্ঠানের কর্মসূচি আয়োজন করার প্রয়োজন হলে হাকিম স্যার না হলে সেটি হওয়া সম্ভব হতো না। ভিলেজ পলিটিক্সের কারণে কখনো কখনো স্কুল-স্বার্থবিরোধী কোনো তৎপরতা হলে সেটি মোকাবেলা কিভাবে করতে হবে বা করা দরকার হাকিম স্যার সেগুলো করতেন। এই কাজগুলো শিক্ষক, ছাত্র এবং স্কুলের শুভাকাংক্ষীদের সমন্বয় করে করতেন। তবে তা করা হতো নিভৃতে নীরবে।

সনটা সুনির্দিষ্টভাবে মনে নেই। সেটি ১৯৬২ বা '৬৩ সাল হবে। রুমি ভাই এবং আমি ঢাকা গিয়েছি। ঢাকা স্টেডিয়ামে সেসময় এমসিসির সঙ্গে পাকিস্তান টিমের টেস্ট ক্রিকেট চলছিল। ঢাকায় গিয়ে নিয়মিত ফুটবল বা অন্য খেলা দেখতাম। ক্রিকেট খেলাও দেখি। সেসময় সিগারেট কোম্পানী মোটা আর্ট পেপারে মাথার ক্যাপ বিলি করতো। অনেক ক্যাপ জমিয়েছিলাম। বাড়িতে আসার সময় কয়েকটি টেনিস বল নিয়ে আসি। সম্ভবত রুমি ভাই ঢাকায় খেলা দেখেছেন। বিকালে স্কুল মাঠে টেনিস বল আর একটা কাঠের টুকরো ব্যাট দিয়ে খেলা আরম্ভ করি। আমাদের খেলা দেখে বড় ক্লাসের ছাত্ররাও ক্রিকেটের প্রতি উৎসাহ দেখায়। এরমধ্যে শোভাকাজী ভাই ফুটবল ক্যাপ্টেন ছিলেন। হীরা মিস্ত্রির বাড়ির একজন ছাত্র এরসাথে যোগ দেয়। সে কাঠ দিয়ে গোল করে একটি বল বানিয়ে আনে। এখানে উল্লেখ করতে হয়, আমাদের অঞ্চলে তখন ক্রিকেট খেলা না হলেও ক্রিকেট অনুরাগী অনেকেই ছিলেন। যারা ঐসময় রেডিওতে সকল আর্ন্তজাতিক ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী শুনতেন এবং আলোচনার ঝড় তুলতেন। এদের মধ্যে ছিলেন নারায়ণ পোদ্দার, নরেশ চৌধুরী, গণেশ ডাক্তার, সাজু মিয়া, কামাল মিয়া প্রমুখ। নারায়ণ পোদ্দারের ঘরে রেডিওতে ধারাবিবরণী শোনা এবং পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাওয়া আর ক্রিকেট নিয়ে আলোচনার ঝড় তোলা হতো। শুনতে বড় লোভ হতো। সুতরাং খেলার সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের মাথায় ক্রিকেট খেলার প্রশ্নটি ঘুরপাক খেত। আমরা ছোটরা যখন এটা শুরু করি তখনই তারা এটা লুফে নেয়। সরঞ্জাম ছাড়া ক্রিকেট খেলা যায় না। হাকিম স্যারের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি সকলকে ডেকে বললেন, তোমরা হেড স্যারের কাছে ক্রিকেটের সরঞ্জামের জন্য একটা আবেদন কর। এরপর আমি দেখছি। রাতারাতি ঘটে গেল কাণ্ড! স্যার ক্রিকেটের পুরো সরঞ্জাম আনিয়ে দিলেন। ক্রিকেটের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বই আনালেন। শ্যাম মুন্সি স্যার বই পড়ে পড়ে আম্পায়ারিং করলেন। হাকিম স্যার, ওয়াহেদ আলী স্যার এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্কুলে জোরেসোরে ক্রিকেট শুরু হল। কুমারদহের বকুল ভাইয়ের ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু ধারণা ছিলো। পালবাড়ির আলমগীর হোসেন বাচ্চু, হাম্মাদ, খলিল মোল্লা এরা থাকাতে নিয়ম-কানুন শিখে ক্রিকেট জোরেসোরে শুরু হতে বেশি সময় লাগেনি। এরপর তো ঘটনা। শুরু হলো টুর্নামেন্ট। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ, পাঞ্জী প্রহরী, ইব্রাহীমপুর (আমাদের দেখাদেখি ক্রিকেট খেলা শুরু করে) এদের সঙ্গে টুর্নামেন্ট হতো। সারাদিন খেলা। লাঞ্চ, টি-টাইম, ধুমধামের সাথে খেলা। মাইকে ধারাবিবরণী। অজপাড়া গাঁ, তার মধ্যে

দুই-তিনশত দর্শক। ভাবা যায় সেদিনকার কথা! তারাপদ ঘোষের ভরাট গলায় প্রকৃতি ও দর্শকদের মানসিক অবস্থা মিশিয়ে চমৎকার কথার গাঁথুনি দিয়ে অনর্গল ধারাবিবরণী পুরো খেলাকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিত। যা আবহ সুরের মূর্ছনার মত করে দর্শকের হৃদয় ভরে তুলতো। তারাপদ ঘোষের এই গুণ আযাদ কিছুটা রপ্ত করতে পেরেছিলো। এখানে উল্লেখ্য, এরও পূর্বে স্কুলে হকি খেলার প্রচলন ছিলো।

ফুটবল টুর্নামেন্ট, ইন্টার স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট, ডিসেম্বরে ইন্টার স্কুল স্পোর্টস এগুলো ছিলো প্রতি বছরের বাৎসরিক উৎসব পালনের মতো। শুধু কি স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক? এলাকার ধনী-গরীবসহ বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার ক্রীড়ানুরাগী দর্শক, সব মিলে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। খেলাধুলায় আমাদের স্কুল সবসময় শীর্ষে থাকতো। তবে ইব্রাহীমপুর স্কুলের সঙ্গে চলতো হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কোন স্কুল শীর্ষে থাকবে? ঝিটকা, খাবাশপুর সেভাবে প্রতিযোগিতায় সমান হতে পারতো না। আলোক ভাই (মিরাজউদ্দীন) তৎকালীন কেন্দ্রীয় পাকিস্তানে এই অজপাড়া গাঁ থেকে পোলভল্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তিনি স্বর্ণ পদক জিতেন। আলোক ভাই অনেকগুলো ইভেন্টেই ইন্টার স্কুলে ফার্স্ট হতেন, প্রভিন্সেও স্থান করেছেন। তিনি যদি আধুনিক প্রশিক্ষণ পেতেন তাহলে তাঁর অবস্থান কি হতো তা সহজেই অনুমেয়। আলোক ভাইর ছোট ভাই সিরাজউদ্দীনও ভাল স্পোর্টসম্যান ছিল। কোনোকোনোটিতে মহিউদ্দিনও ভাল করেছে।

হাকিম স্যার ও ইয়াকুব স্যার খুব ভাল ফুটবল খেলতেন। মানিকগঞ্জ জেলার মধ্যে আমাদের থানাটি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় ছিল অনেক উঁচু মাত্রায় ও বিস্তৃত। ঝিটকা, সুতালড়ী, বয়ড়া, পিপুলিয়া, ইব্রাহীমপুর প্রভৃতি এলাকায় অনেক ফুটবল টুর্নামেন্ট হতো। এসব টুর্নামেন্টে হাকিম স্যার, ইয়াকুব স্যারসহ সে সময় যে সব ছাত্র ও স্থানীয় ফুটবলার ছিলেন তারা অংশ নিতেন।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে রেজাল্টের পর স্কুলে আয়োজন করা হতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান – নাটক, গান, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি। এছাড়া নজরুল-রবীন্দ্র জয়ন্তী এগুলোও মাঝেমধ্যে অনুষ্ঠিত হতো। এসব অনুষ্ঠান যাতে শিল্পসম্মত হয় তার জন্য সময় নিয়ে রিহার্সেল দিতে হতো। নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে অমূল্য স্যার ও মতিন স্যার নিষ্ঠার সাথে প্রশিক্ষণ দিতেন। পরবর্তীতে নাসির স্যার যুক্ত হয়েছেন। তবে হাকিম স্যারের প্রত্যক্ষ অংশ না থাকলেও নেপথ্যে তাঁর জোরালো ভূমিকা থেকেছে।

শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি উপন্যাসটি অমূল্য স্যার নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন। আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। ক্লাসে ক্লাসে নোটিশ এল যারা নাটকে অংশ নিতে চায় তারা যেন ক্লাস-টিচারের কাছে নাম লিখে দেয়। আমাদের ক্লাস থেকে মনোরঞ্জন শর্মা ও আমি নাম দেই। অন্যান্য ক্লাস থেকেও অনেকেই নাম দিয়েছেন। একদিন আমাদের ডাক পড়লো। আগেই বলেছি আমাদের অঞ্চলটিতে শিক্ষানুরাগী, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক চর্চায় অনেক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিশেষ করে স্কুলের জন্য স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে আবেদন ছিল অনেক বেশি। শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে ভোলা ডাক্তার, মোজাফ্ফর হোসেন চৌধুরী, শান্তি প্রিয় পাল, ডা. ক্যাপ্টেন (অব.) আলীমসহ অনেকে। সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চায় রাজেন্দ্র ধোপা, পাঠানকান্দির দত্ত, আরো অনেকে। নাটকের চরিত্র বাছাইয়ে স্যারের পাশাপাশি রাজেন্দ্র ধোপাসহ এরাও উপস্থিত থাকতেন। শেষ পর্যন্ত আমি সিলেক্ট হলাম। ছাত্রদের মধ্যে মন্টু ঘোষ, রুমি-রেন্টু ভাই, কাজী রফিক এরা। এছাড়া মতিন স্যার, ধীরেন দত্ত প্রমুখ। প্রতিদিন রিহার্সেল হতো। রাজেন্দ্র ধোপাসহ অনেকেই নিয়মিত রিহার্সেলে উপস্থিত হতেন এবং আমাদের উৎসাহ দিতেন। নাটক মঞ্চস্থ হলো। এই নাটকে মনোরঞ্জন শর্মা নারায়ণির চরিত্রে অভিনয় করেছিল। সে চমৎকার অভিনয় করে। আমি করেছিলাম গোবিন্দের অভিনয়। এই নাটকে দুটো রুইমাছের ভূমিকা ছিলো (নাম কার্তিক ও গণেশ)। রাজেন্দ্র ধোপা ৭/৮ কেজি ওজন সাইজের দুটি রুই মাছ মাটি দিয়ে বানিয়ে আনেন। দর্শকরা বুঝতেই পারেনি যে এটা মাটির তৈরি মাছ। খেপলা জালে আটকা দুটো মাছ যখন টেনে জাল থেকে ছাড়ানো হলো, মনে হচ্ছিল সদ্য ধরে আনা দুটো টাটকা রুই মাছ।

রাজেন্দ্র ধোপা বড় মাপের শিল্পী ছিলেন। সেসময় পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী চারুকারু শিল্পের প্রতিযোগিতা হয়। রাজেন্দ্র ধোপা চর্মশিল্পী আর লিয়াকত আলী খান ছোট মূর্তি তৈরি করে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। শিল্পকর্মগুলো এত জীবন্ত ছিলো তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঐ প্রতিযোগিতায় ঐ সময় তিনি মৃৎশিল্পে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি শুধু একটি সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন। ভাল বাউল সঙ্গীতও রচনা করেছেন তিনি। শোনা যায় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণচন্দ্র দাস তার রচিত বাউল সঙ্গীত গেয়েছেন। নাটকের পর থেকে রাজেন্দ্র ধোপা ও ভোলা ডাক্তারের স্ত্রী কাকিমা যতদিন বেঁচেছিলেন আমাকে গোবিন্দ বলেই ডাকতেন।

আর্ট কাউন্সিলের সাথে স্কুলের রেষারেষি ছিল। আর্ট কাউন্সিল খুব জাঁকজমক করে দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে টিকিটের বিনিময়ে। ডিএল রায়ের শাহজাহান এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তের মায়ামৃগ। বাজারে একটি পাটের গোডাউন ছিল। জেনারেটর (তখন ডায়নামো বলা হতো) দিয়ে লাইটিংয়ের মাধ্যমে নাটকটি হয়। বুলবুল একাডেমী থেকে নৃত্য ও আবহ সংগীতের জন্য শিল্পী আনা হয়। শাহজাহান নাটকে আমাদের কয়েকজন অংশ নেয়ার কথা থাকলেও স্কুলের নিষেধের কারণে নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার একদিন আগে নাম প্রত্যাহার

করে নেই। এছাড়া কুমারদহ গ্রামটির অনেকেই সংস্কৃতি চর্চায় অংশ নিতেন।

স্কুলে কখনই প্রত্যক্ষ রাজনীতির চর্চা হতো না। তবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ছাত্ররা মুখ ফিরিয়ে থাকেনি। ১৯৬৮-৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী গণভ্যুত্থানের সময় প্রাক্তন ও চলমান ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কলেজে থাকা অবস্থায় হারুন মোল্লা, আওলাদ হোসেন এরা প্রত্যক্ষভাবে ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলো। পরবর্তীতে গোলাম মহিউদ্দিনও যুক্ত হয়। তবে সেসময় গোলাম মহিউদ্দিন দেবেন্দ্র কলেজকেন্দ্রিক ছিল। '৬৮-'৬৯ সালে খন্দকার ইয়াকুব হোসেন, লিয়াকতের বড় ভাই এরা গ্রামে আসে। একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হিসাবে ইয়াকুব এবং সম্পাদক আওলাদ ও অর্থদপ্তর সম্পাদক হারুণ মোল্লা। ঝিটকার রেজাউলসহ আমরা অনেকেই এই কমিটিতে থাকি। প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ে। এই সংগ্রাম কমিটি থানার অন্যান্য স্কুলের সাথে সমন্বয় ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে কোনোরকম সামাজিক বা গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেয়নি। অনেকের অভিভাবক যারা চেয়ারম্যান, মেম্বার তারা ঐ সময় প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম লীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ তাদের ভালো লাগেনি। অনেকের অভিভাবক তাদের সন্তানদের বাধা প্রদান করে এবং কথা না শুনলে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেয়। হারুণ মোল্লা জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতে পারতেন। তার বাবা-চাচার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ জনসভায় বক্তব্য দেওয়ায় বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। হারুণ মোল্লা অত্মসমর্পণ করেনি সে হুমকিতে। বাড়ি থেকে চলেও যান। পরে মুসলিম লীগের মহকুমা নেতা সৈয়দ বজলুল হক (মাণিকগঞ্জ) হারুণ মোল্লার চাচাকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন মহিউদ্দিন ও হারুণ মোল্লা তার বাসায় থেকেই স্ব-স্ব পছন্দ অনুযায়ী রাজনীতি করছে। তিনি তাদের বাধা দেননি। রাজনীতি ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার বিষয়। একে-অন্যের উপর তা চাপানো ঠিক নয়। বিষয়টি এভাবেই মিটে যায়। এখানে উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলনেও আমাদের স্কুলের ছাত্ররা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। আলোকভাই (এ.কে.এম. মিরাজ উদ্দিন) ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় নভেম্বর মাসে মাণিকগঞ্জ বানিয়াজুরি এলাকা হতে পাকিস্তানি মিলিটারি ও রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। পরে আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তিনি শহীদ হন।

ভোলা যায় না হেড স্যার সামসুদ্দিন আহম্মেদের কথা। তিনি নিরঅহংকার এমন এক প্রশাসক যিনি ছাত্রদের দু হাত ভরে দিয়েছেন। স্কুলের জন্য, ছাত্রদের জন্য তার অবদান লিখে বলা যাবে না। তার সময়কার ছাত্ররা হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করেন।

এসকল ঘটনার মধ্য দিয়ে পাটগ্রাম স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি ও তার গুণগত মান খানিকটা উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানের কলি মনে পড়ছে –

পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সেই কি ভুলা যায়।

লেখক ১৯৬৬ সালে এই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন।

কৌতুক

১. একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার টেলিফোন সেট নিয়ে দোকানে গেলেন মেরামত করতে। টেলিফোন মেরামতকারী ভালভাবে দেখে বললেন যে, টেলিফোন সেটটি ঠিক আছে। তখন বৃদ্ধ মেরামতকারীকে রেগে বললেন, 'তাহলে আমার ছেলেরা বিদেশ থেকে ফোন করে না কেন?'

২. প্রতিটি মানুষের জীবনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ আছে। এক, তারুণ্য যখন সময় ও শক্তি প্রচুর কিন্তু টাকা পয়সার অভাব। দুই, কর্মজীবন যখন টাকা ও শক্তি প্রচুর কিন্তু সময় নাই। তিন, বৃদ্ধকাল যখন সময় ও টাকা প্রচুর কিন্তু শক্তি নাই।

সংগ্রহ: তারিকুল ইসলাম, ম্যানেজার (স্পেশাল প্রোগ্রাম)

শিক্ষালোক

পুরনো স্কুল/কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক/শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উপর শ্রদ্ধার্ঘ্য, স্থানীয় পর্যায়ে যেকোন ব্যতিক্রমী শিক্ষা-উদ্যোগ, সৃষ্টিশীল পাঠদান কৌশল সহ শিক্ষা বিষয়ে আপনার মূল্যবান ভাবনা-চিন্তা লিখে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন।

শিশুদের পড়ানোর সাথে সাথে আর কী কী করা যায় শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা

সিদীপ প্রতি বছর কর্মকর্তা, কর্মী ও শিক্ষিকাদের জন্য কোন একটি বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। এর মাধ্যমে চিন্তাচর্চায় সবাই উৎসাহিত হয়। ভাল কিছু লেখা বাছাই করে সংস্থা বিভিন্ন পুস্তক/পুস্তিকা প্রকাশ করে। গত বছরের মতো এবারও শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচিতে নিয়োজিত শিক্ষিকাদের জন্য 'শিশুদের পড়ানোর সাথে সাথে আর কী কী করা যায়' শীর্ষক একটি রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষিকাগণ ভাল ভাল লেখা জমা দেন। এসব রচনা পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রতি অঞ্চল থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারী সহ মোট ৪২ জন বিজয়ী নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়াও সমগ্র বিজয়ীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ১ম নির্বাচন করা হয়েছে। বিজয়ীদেরকে অর্থ-পুরস্কার, বই-পুরস্কার ও সনদ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ভাল কিছু লেখা আমরা প্রকাশেরও ব্যবস্থা করবো। নিচে রচনা-প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের তালিকাটি দেওয়া হলো।

শিক্ষিকা	শাখা ও অঞ্চল	স্থান	শিক্ষিকা	শাখা ও অঞ্চল	স্থান
শিমুলী বেগম	ময়নামতি	১ম	আকলিমা আক্তার	চাটখিল, বজরা	১ম
নাইমা আক্তার	ভরসারবাজার, ময়নামতি	২য়	মারজাহান আক্তার	দাগনভূঁইয়া, বজরা	২য়
শাহরিন জাহান	ময়নামতি	৩য়	সালমা আক্তার লতা	বজরা	৩য়
মর্জিনা আক্তার	গাজীপুর সদর, মাওনা	শ্রেষ্ঠ	রেহানা আক্তার	ওয়ারুক, হাজীগঞ্জ	১ম
শামীমা খাতুন	গাজীপুর সদর, মাওনা	২য়	নাজমা বেগম	রহিমানগর, হাজীগঞ্জ	২য়
আফরোজা লিমা	মাওনা	৩য়	আফসানা আক্তার	শাহরাস্তি, হাজীগঞ্জ	৩য়
তাছলিমা বেগম	সলিমগঞ্জ	১ম	মীর রেশমী	মদনপুর, সোনারগাঁও	১ম
সাহিনা আক্তার	রূপসদী, সলিমগঞ্জ	২য়	মাহমুদা	মদনপুর, সোনারগাঁও	২য়
নাদিরা সুলতানা	ভোলাচং, সলিমগঞ্জ	৩য়	আয়েশা আক্তার	সোনারগাঁও	৩য়
আফসানা আক্তার	মুন্সীগঞ্জ সদর, টঙ্গিবাড়ী	১ম	লাকি বিশ্বাস	কাশিমপুর, আশুলিয়া	১ম
বুলবুলি আক্তার	টঙ্গিবাড়ী	২য়	হীরা মতি পান্না	পূবাইল, আশুলিয়া	২য়
শাহনাজ আক্তার	মুন্সীগঞ্জ সদর, টঙ্গিবাড়ী	৩য়	জেসমিন আক্তার	আশুলিয়া	৩য়
ফারজানা আক্তার	জিনসার, লাকসাম	১ম	জোসনা আক্তার	সাচার, তিতাস	১ম
ফরিদা ইয়াছমিন	জিনসার, লাকসাম	২য়	শিউলী আক্তার	রায়পুর, তিতাস	২য়
মাজেদা বেগম	খিলাবাজার, লাকসাম	৩য়	মিনা আক্তার	মাথাভাঙ্গা, তিতাস	৩য়
শিউলি আক্তার	দাসেরহাট, মাইজদী	১ম	রোমানা আক্তার	মান্দারী, লক্ষীপুর	১ম
জান্নাতুল ফেরদৌস	সোনাপুর, মাইজদী	২য়	ফাতেমা আক্তার	ফরিদগঞ্জ, লক্ষীপুর	২য়
ফারজানা বেগম	খলিফারহাট, মাইজদী	৩য়	তানজিলা হাসান	মান্দারী, লক্ষীপুর	৩য়
রানু আক্তার	চারগাছ, কুটি	১ম	সাথিয়া আক্তার রাবিয়া	বড়কুমিড়া, বারইয়ারহাট	১ম
জাহানারা হক	চারগাছ, কুটি	২য়	জন্টু রানী নাথ	কালিদহ, বারইয়ারহাট	২য়
তাহমিনা আক্তার	সাহেবাবাদ, কুটি	৩য়	পাপিয়া মল্লিক রিতা	বারইয়ারহাট	৩য়

পথের মানুষ

আবু মহম্মদ রইস

গ্রামের নাম পুষ্পপাড়া। আগে কখনো শুনিনি। তাই নাম শুনেই গ্রামটার প্রতি আমার পক্ষপাত হয়ে গেল। ঢাকা হেড অফিসে বসে যখন নির্ধারণ হচ্ছিল কে কোথায় যাবে, আমি বললাম, আমি পুষ্পপাড়া যাব।

পুষ্পপাড়া পাবনা শহরের অদূরবর্তী ছোট একটি গ্রাম। শহর থেকে দূরত্ব নয় কিলোমিটার। গ্রামের পাশ দিয়েই চলে গেছে উত্তরবঙ্গের প্রধান সড়ক। যাতায়াতের বেশ সুবিধা, হরদম বাস চলছে। আজ সকালে আমরা তিনজন বাসে করেই এসেছি। তিনজন মানে বাকি দুজন আমার স্থানীয় সহকর্মী।

আমাদের অফিস মাস খানেক হলো জাতিসংঘের একটি রিসার্চ প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। সারাদেশেই কাজ চলছে। পাবনা জেলার জন্য এখানে বেছে নেয়া হয়েছে তিনটি গ্রাম। সহকর্মী দুজন এখানেই আমাদের স্থানীয় অফিসের কার্যনির্বাহী। আমি এসেছি হেড অফিস থেকে। সপ্তাহখানেক থাকব, কাজের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করব, উপদেশ-নির্দেশ কিছু দেয়ার থাকলে দিব, তারপর চলে যাব।

বছর দুই হতে চলল আমি এই অফিসে ঢুকেছি। এ ধরনের কোন চাকরি করব এ রকম ইচ্ছা জীবনে ছিল না। পাস করার পর কিছুদিনের মধ্যেই সুযোগটা মিলে গেল। ভালো বেতন। ভাবলাম যতদিন বিসিএস দিয়ে সরকারি চাকরি না পাই, করতে থাকি। ভালো না লাগলে করব না। কিন্তু কাজ করতে এসে আমার ভালো লাগছে।

এই যে আজ যখন গ্রামের ধূলোমাখা পথ ধরে হাঁটছিলাম, সরল সাধারণ মানুষগুলোর জীবনযাপন কর্মপ্রবাহ দেখছিলাম, তাদের সাথে কথা বলছিলাম, খুব ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন আমার নিজের দেহের শিরা-উপশিরাকেই নতুন করে চিনতে পারছি। এতদিন বাস আর ট্রেনের জানালা দিয়ে আমি আমার দেশকে যতটা দেখেছি, বই আর পত্রিকার পাতায় যতটা জেনেছি আজ দেশের বুকের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল, আসলে এতোদিন আমি তেমন কিছুই দেখিনি। এই চাকরিতে না ঢুকলে হয়তো এই দেখার সুযোগ আমার হতো না।

সহকর্মী দুজন গ্রাম সম্পর্কে আমার এতোটা উৎসাহ দেখে তো একবার বলেই ফেলল, স্যার আপনি বদলি নিয়ে ঢাকা থেকে এখানে চলে আসুন। আজ সকালে যখন আমরা পুষ্পপাড়া গ্রামে এসে নামলাম, চলার পথে ওরা দুজন বোধ হয় আমার হাবভাব দেখেই উৎসাহটা বুঝতে পেরেছিল। দুজনই বিএ পাস, কিন্তু দুজনের মধ্যে তাজুল ইসলামের উপস্থিত বুদ্ধিটা বেশি। কিছু দূর যেতেই সে বলল- স্যার, আপনি তো গ্রাম ঘুরেফিরে দেখতে চেয়েছেন, আমরা একজন না হয় আপনার সাথে থাকি। আপনি তো আরো পাঁচ দিন আছেন, যে কাজে এসেছেন তার জন্য আপনার দুতিন দিনই যথেষ্ট।

তাই হলো। তবে আমি ওদের কাউকে সাথে নিলাম না। আমি একা একাই আলাদা হয়ে গেলাম। যে পথে হাঁটতে ইচ্ছে করল, হাঁটলাম। যে গাছের ছায়ায় বসতে ইচ্ছে করল, বসলাম। পথের মানুষকে ডেকে ডেকে গল্প করলাম। পিপাসায় কাতর হয়ে এক গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে পানি খেলাম।

কথা ছিল দুপুর নাগাদ আমরা সবাই বাসস্ট্যান্ডে ফিরে আসব। বাসস্ট্যান্ডে মানে রাস্তার ধারে বড় একা বটগাছ, তার নিচে। একটা সিমেন্টের বেঞ্চ। কোন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নাকি

ভোটের আগে এই বেঞ্চখানা বানিয়ে দিয়েছেন। এটাই পুষ্পপাড়া বাসস্ট্যান্ড বলে পরিচিত। আবার কেউ কেউ বলে বটতলী।

আমি এসে দেখলাম সহকর্মী দুজন এখনো আসেনি। বটের ছায়া গভীর কিন্তু বেঞ্চে একটি লোক শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। সকাল থেকে হাঁটাহাঁটি করে পায়ের উপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। একবার ভাবলাম লোকটিকে ডাকি কিন্তু এভাবে একজনের ঘুম ভাঙাতে মন সরল না। শেষ পর্যন্ত মাটিতেই ঘাসের উপর বসে পড়লাম।

আমার কাঁধে রামপুরী ঝোলা ব্যাগের মধ্যে টুকিটাকি কাগজপত্র আর কিছু শুকনো খাবার ছিল। গ্রামের পথে বেরুলেই এই ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বেরুনো আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। ব্যাগের ভিতর থেকে একটা কেক বের করে বসে বসে খেতে থাকলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটির ঘুম ভাঙল। সে চোখ মেলে আমাকে এভাবে নিচে বসে দেখেই ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে আমার চোখে পড়ল, তার কাঁধে একটা দোতারা ঝুলানো। যন্ত্রটা সে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে ছিল, আমি দেখতেই পারিনি। লোকটির ঘুম জড়ানো ভাব অল্পক্ষণের মধ্যে কেটে গেল। ভাই সাহেব আপনে এহানে বসে আচেন, আমি বুজতে পারি নাই। আপনে উপরে উঠে বসেন।

তার কাচুমাচু ভাব দেখে আমি তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম - না না, আমি তো এখানে ভালোভাবেই বসে আছি। আপনি উঠে পড়লেন কেন? আপনি ঘুমান।

ভাই সাহেব আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমারে মাফ করে দেন।

আমি যতই তারে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, রাস্তার ধারে ফাঁকা বেঞ্চ, এটা তো মানুষের বিশ্রামের জন্যই, তার মুখে সেই একই কথা, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ করে দেন। শেষে আমি বললাম ঠিক আছে আপনি বসুন। লোকটি অদূরে কাচুমাচু হয়ে মাটির উপর বসল। দোতারাটা কোলের উপর তুলে মাথা নিচু করে রইল।

আমি তাকে নীরবে কিছুক্ষণ দেখলাম। বয়স পঁয়ত্রিশও হতে পারে পঁয়তাল্লিশও হতে পারে, চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে ময়লা একটা বেলবটম প্যান্ট। গায়ের শার্টটা অত্যন্ত চাপা এবং ছোট। দেখেই বোঝা যায় হয় এটা দানে পাওয়া না হয় ফুটপাতের পুরনো কাপড়ের দোকান থেকে কেনা। মুখে পানের লালিমা, মাথায় বাবরি ছাঁট চুল, পায়ে রাবারের কালো পাম্প সু। তার সমস্ত অবয়বের সাথে কাঁধের দোতারাটা আমার কাছে একেবারে বেমানান মনে হলো। জিজ্ঞাসা করলাম – আপনি কি গান করেন?

লোকটি আত্মমগ্ন হয়েই জবাব দিল– জ্বি।

কী গান করেন?
তার তো কোন ঠিক নেই। যখন যা বায়না আসে।

বুঝতে পারলাম সে পথেঘাটে মানুষের ইচ্ছা মতো গান করে। গান তার কাছে সাধনা নয়, গান হলো তার জীবিকার উপায়। এ রকম চরিত্র আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। বাসে ট্রেনে ফেরিঘাটে এ ধরনের গায়ক হরহামেশাই চোখে পড়ে। কিন্তু একেবারে মডার্ন পোশাক পরে দোতারা বাজিয়ে পথেঘাটে কেউ গান করছে, এরকম দৃশ্য এখনো চোখে পড়েনি। কৌতূহলী হয়ে বলে ফেললাম, শোনান দেখি একটি গান।

শুনবেন বলে সাথে সাথে সে নড়েচড়ে বসল। কোলের উপর থেকে দোতারাটা কাঁধে তুলে টুং টাং করে তারে সুর বাঁধতে থাকল।

এতো তাড়াতাড়ি সে রাজি হয়ে যাবে আমি ভাবিনি। একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছে। তাছাড়া শ্রোতা বলতে আমি একাই। লাভের দিক বিবেচনা করলেও তার এতোটা উৎসাহী হওয়ার কথা নয়।

গান শুরু হলো, 'তোমার প্রেমে আমি দিওয়ানা' হয়েছি। তোমাকে ছাড়া আর বাঁচব না, যতই আসুক বাধা পিরিতের পথে, কোনো বাঁধন আমি মানব না। আমি খেয়াল করছিলাম সে সুরের সাথে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে কণ্ঠ ভাঁজছে, আর তালে তালে শরীর মাথা সব দোলাচ্ছে। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, সে যদি দাঁড়িয়ে গাইত এতক্ষণে নাচানাচি শুরু করে দিত।

গানের বাণী এবং সুর শুনে অনুমান করলাম সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কোন সিনেমার গানই হবে। কিন্তু অনুমান করতে পারলাম না, এ গান সে শুরু করল কেন। যতক্ষণ গান শেষ না হলো একটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে লাগল – এতো সুন্দর যার কণ্ঠ, যে এতো চমৎকার দোতারা বাজায়, সে এ গান গায় কী করে।

গান শেষ হলে বললাম আপনার কণ্ঠ চমৎকার। কিন্তু আপনি এ গান শিখলেন কোথা থেকে?

আমার প্রশংসা তাকে খুব একটা আকৃষ্ট করল বলে মনে হলো না। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, গ্রামের মধ্যে এক দোকানে ক্যাসেট আছে, ঐ ক্যাসেটে গান শুনে শিখিছি।

এটা কি কোন সিনেমার গান?

জ্বী। এই সিনেমাটা এখন পাবনা টাউনে চলতেছে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। চট করে আর কোন কথা মুখে এলো না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর বললাম, আপনি আর কোন গান জানেন না?

এবার লোকটি একটু গর্বের হাসি হেসে বলল, জ্বী, সব রকম গানই জানি! নানান ঘাটে ঘুরিফিরি নানান মানুষের মন জুগাই, সব রকম গান না জানলি কি আর হয়। একটা গান গাওয়ার পর সে কিছুটা সহজ হয়ে উঠেছে।

বললাম, ঠিক আছে এবার তাহলে অন্য একটা গান শোনান। সিনেমার গান নয়।

সে সম্মতিসূচক একটু ঘাড় দুলিয়ে মুখে বিগলিত হাসি হাসল। তারপর নিঃশব্দে মাথা নিচু করে দোতারায় সুর তুলল। গান যখন শুরু করল, তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা থাকল না। এবার সে শুরু করেছে রবীন্দ্র সংগীত 'মায়াবন বিহারিণী হরিণী, গহন স্বপন সঞ্চারিণী'। দোতারা বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত আমি কখনোই শুনিনি, তার উপর অশুদ্ধ উচ্চারণ।

গানের স্থায়ীটা শেষ হতেই আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। বললাম এটা কী গান গাইছেন?

কেন বিশ্ব কবির লেখা গান। লোকটি অসংকোচে জবাব দিল। এ গানও কি আপনি ক্যাসেট শুনেই শিখেছেন?

জ্বী।

তা আপনি হঠাৎ এ গান ধরলেন কেন?

স্যার আপনাদের মতো ভদ্দরলোকরা তো এইসব গানই পছন্দ করে। হয় সিনেমার গান, না হয় বিশ্ব কবির গান।

এরপর আমি কী বলব, ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কেননা সে যা বলছে, তা হয়তো তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছে। এ সম্পর্কে কোন মতামত না দিয়ে বললাম, আমি হয়তো এখনো তেমন ভদ্রলোক হতে পারিনি। আপনি দোতারা বাজিয়ে যেসব গান গান, সেসব গান জানেন না?

লোকটি উৎসাহী হয়ে বলল, জানি স্যার।

তাহলে তাই শোনান।

এরপর আর সে কোন কথা বলল না। নড়েচড়ে বসে দোতারাটা ঠিক করে নিল। তারপর চোখ বন্ধ করে শুরু করল লালনের সেই অবিস্মরণীয় গান – 'আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াময়, পাড়ে লয়ে যাও আমার।'

গান শুনছিলাম আর মাঝে মাঝে তার নির্মিলিত চোখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। সুরের ওঠানামার সাথে তার চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হচ্ছিল, সমস্ত হৃদয়টা যেন সুরের মধ্যে গলে ঝরে ঝরে পড়ছে। বাণী এবং সুরে তো আছেই, লোকটির কণ্ঠেও যে অপার ঐশ্বর্য আছে, এতক্ষণ আমি তা বুঝতে পারিনি। যখন সে বলছিল, 'দয়াল তোমা বিনে ঘোর সংকটে না দেখি উপায়, পাড়ে লয়ে যাও আমায়' - মনে হচ্ছিল সে যেন কেবল তার একার নয় সমস্ত মানব জাতির হয়েই সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা জানাতে বসেছে।

গানের সঙ্গে আচ্ছন্ন হয়ে কখন যে আমিও দুচোখ বন্ধ করে ফেলেছি বুঝতেই পারিনি। গান শেষ হলে তাকিয়ে দেখি সহকর্মী দুজন দূর থেকে এগিয়ে আসছে। আমার সুরের ঘোর তখনো কাটেনি। লোকটি পাশ থেকে বলে উঠল, ভাই সাহেব আরেকটা গাব?

আমি একটু ভেবে বললাম, না থাক। লোকটি কী মনে করল জানি না, সে আর কিছু বলল না। আমি পকেট থেকে বিশ টাকার একটি নোট বের করে তার হাতে দিলাম, সে টাকাটা হাতে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

তাজুল আর ইউনুস সামনে এসে দাঁড়াল। স্যার কতক্ষণ হয় এসেছেন?

আধা ঘণ্টা হয়েছে।

আমরা আরো ভাবছিলাম, আপনি হয়তো এতক্ষণও ফেরেননি। সরি স্যার।

না ঠিক আছে। আমার কোন অসুবিধা হয়নি। সময়টা বরং আরো ভালো কেটেছে। আমরা কথা বলতে বলতে একটা বাস এসে থামল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম, দেখলাম খুব একটা ভিড় নেই। বাস যখন ছেড়ে দিল জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, লোকটি এক দৃষ্টিতে আমাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে আছে। পথকে পেছনে ফেলে বাস এগিয়ে চলল, লোকটি আস্তে আস্তে বিন্দুর মতো হয়ে মিলিয়ে গেল।

রেস্ট হাউসে ফিরে দুপুরে খাওয়ার পর সারাটা বিকেল নিঃসঙ্গ কাটল। বিশ্রামের জন্য বিছানায় একটু গা এলিয়ে দিলাম, কিন্তু বিশ্রামও হলো না। সন্ধ্যার দিকে তাজুল আর ইউনুস কিছু কাগজপত্র হাতে নিয়ে এলো। বললাম, এখন কাগজপত্র থাক পরে দেখব, চলুন আপনাদের শহরটা বরং একটু ঘুরে দেখি। আমার প্রস্তাব শুনে সঙ্গে সঙ্গে দুজন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে দাঁড়াল। হাবভাব দেখে মনে হলো মনে মনে তারা যেন এই প্রস্তাব নিয়েই এসেছিল।

শহরটা ছোট অথচ জীর্ণশীর্ণ। পথঘাট আর দালানকোঠা যা চোখে পড়ছিল, তাতে প্রাচীন ঐতিহ্যের ছাপ আছে, কিন্তু যত্ন এবং পরিচর্যার কোন লক্ষণ নেই। নতুনের মধ্যে শুধু চোখে পড়ল দুএকটা মার্কেট। পাবনা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদীও দেখলাম। এখন আর তাকে নদী বলা যাবে না, বড়সড়ো একটা ড্রেন। বর্ষার পানি আসে না। নোংরা আবর্জনা আর আশপাশের মানুষের ব্যবহৃত জঙ্গলে নদীর পরিসর ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। ইছামতির এই অবস্থা দেখে আমার বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গুমরে উঠল। মনে হলো নদীমাতৃক এই দেশ কথাটি বোধহয় আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছেই অপরিচিত হয়ে যাবে।

তাজুল আর ইউনুস চা খাওয়ার নাম করে আমাকে নিয়ে বসাল লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। এই দোকানটির নামের সাথে আমি পরিচিত ছিলাম। আমার বড় মামা এক সময় চাকরির সুবাদে পাবনা ছিলেন। তখন তিনি প্রায়ই এই লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার আর প্যারাডাইস সুইটস-এর মিষ্টি নিয়ে যেতেন।

আমাদের চা খাওয়া হলো। চা খাওয়াটা উপলক্ষ্য, আসলে মিষ্টিই খাওয়া হলো। আমি বিল দিতে চাইলাম ওরা কিছুতেই দিতে দিল না। আরো কিছুক্ষণ ঘোরার পর যখন ফেরার সময় হলো তাজুল ইসলাম বলে উঠল, স্যার এবার তাহলে চলুন রাতের খাওয়াটা সেরে নেই।

আমি বললাম, না না তার দরকার নেই। রেস্ট হাউসে তো ওরা আমার খাবার রেখে দেবে।

খাবার রাখবে না স্যার। আমরা বলে এসেছি।

তাই নাকি। এসব আবার করতে গেলেন কেন?

প্রতিদিন তো আর এমন সময় সুযোগ হবে না স্যার। তাছাড়া যখন আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি।

আর কিছু বললাম না। বুঝলাম খরচ তো সব অফিসেরই যাবে। আমাকে উপলক্ষ্য করে তারা যদি একটু আনন্দ পায় পাক।

ইউনুস বলল, স্যার কী খাবেন। পাবনায় তো একটা ভালো হোটেলও নেই। একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট করেছিল তাও মাস্তান আর চাঁদাবাজদের অত্যাচারে উঠে গেছে।

না ঠিক আছে কোথাও চলুন। কিছু একটা খেলেই হলো।

স্যার রূপকথা রোডে নতুন একটা হোটেল করেছে 'খাবার দাবার'। ওখানে প্রতিদিন পাখির মাংস পাওয়া যায়, যাবেন স্যার।

ঠিক আছে চলুন। আমি যদিও পাখির মাংস খাই না। তবুও তাদের উৎসাহে সামিল হয়ে গেলাম।

খেতে বসে দুজন খুব সাধাসাধি করল, স্যার একদিন খান, দেখবেন খুব ভালো লাগবে। চরের পাখি, মাংস খুব স্বাদ।

আমি কেন যে পাখির মাংস খাই না, তাদের ঠিক ভালোভাবে বোঝাতে পারছিলাম না। বললাম আপনারা খান।

আমার জন্য মাটোন বিরিয়ানী আর তাদের জন্য নান রুটি এবং পাখির মাংস অর্ডার দেয়া হলো। দেখলাম ছোট ছোট পাখি আস্ত ভুনা করে দিয়েছে। আমার পাশে বসে দুজন যখন পুরো পাখিটাকে মড় মড় করে দাঁতের মধ্যে পিষছিল, আমি কিছুতেই মুখে ভাত তুলতে পারছিলাম না। সন্ধ্যার পর শহরের মধ্যে ঘুরতে ভালোই লাগছিল, কিন্তু খাবার পর শরীর-মন দুটোই অস্বস্তিতে ভরে গেল।

রেস্ট হাউসে ফিরে একা একা যতবার এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম ততবারই পাশাপাশি প্লেটের ওপর সাজানো দুটি পাখির অবয়ব দেখতে পাচ্ছিলাম। নানান কথা ভিড় করছিল মনের মধ্যে - পাখি দুটি কি চরের উপর জোট বেঁধেই ছিল। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে কি সম্পর্ক হতে পারে। সাথে সাথে উল্টো চিন্তা করারও চেষ্টা করলাম, হোটেলে পাখি তো আর কেবল দুটিই রান্না হয়নি, তাছাড়া সব পাখি যে কেবল একজন এক জায়গা থেকেই ধরেছে তাই বা কী করে ভাবা যায়। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই পেট মোচড় দিয়ে গলগল করে বমি হয়ে গেল। এরপর অস্বস্তিটা একটু কাটল কি কাটল না বুঝতে পারলাম না। ক্লান্ত শরীরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

পরদিন দেরিতে ঘুম ভাঙল। ইউনুস আর তাজুলকে বসিয়ে রেখে নাস্তা করলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম ফিল্ডে।

পুষ্পপাড়া বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে বাস থেকে নামলাম। কন্ডাক্টর বাসের শরীরে ধপাস ধপাস করে দুটো চপেটাঘাত করতেই বাস আবার চলতে শুরু করল। আমি ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে আছে কালকের সেই গায়েন। আমাকে দেখে সে ছালাম দিল। আমি ওয়ালেকুম ছালাম বলে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কী করছেন?

জ্বে কিছু না। এই বসে আছি আর কি!

কেন, আজ গান করতে বের হন নাই?

জ্বে না। শরীরডা আজ দুই দিন হয় ভালো না। তাই কুথাও যাই নাই। এহানেই বসে আছি যদি দুই চারডে গান গাইতে পারি। ভাই সাহেব শুনবেন?

বুঝতে পারলাম শরীরটা তার ভালো না, তবু পেটের তাগিদেই এখানে এসে বসেছে। আর আমি কাল গান শুনে বিশ টাকার একটা নোট দিয়েছিলাম, অনুমান করলাম এই জন্যেই হয়তো আমাকে তার গান শোনানোর আগ্রহ।

সঙ্গী দুজনের মধ্য থেকে তাজুল ইসলাম বলে উঠলেন, গান শুনবেন স্যার, উনার গলা খুব ভালো, আমরা অনেক শুনেছি।

আজ আমি পরিকল্পনা করে বেরিয়েছিলাম কাজে লাগব। কিন্তু পরিকল্পনাটা শিথিল হয়ে গেলো। বললাম, ঠিক আছে তাহলে সবাই বসে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। আপনারা দুজন যান, আমি না হয় আপনাদের খুঁজে নেব। বলেই আমি অদূরে শান বাঁধানো বেঞ্চটার ওপর বসে পড়লাম। সঙ্গী দুজন চলে গেল।

শুরু করব ভাই সাহেব?

দেখলাম লোকটি কোলের ওপর দোতারা তুলে নিয়ে প্রস্তুত। বললাম, ঠিক আছে করুন।

আমার সম্মতি পেয়েই সে যন্ত্রে সুর তুলতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম আজ আবার না জানি কোন গান ধরে। কিন্তু দেখলাম, নাহ সে ঠিকই ধরেছে। শুরু করল লালনের সত্য বল সুপথে চল ওরে আমার মন। গান শেষ হওয়ার পর সে দেখলাম হাঁপাচ্ছে। বুঝলাম আজ শরীরটা তার সত্যিই খারাপ। গতকালের চেয়েও খারাপ।

গান শুনে আমি চুপচাপ শুধু ভাবছিলাম রেডিও টেলিভিশনে যারা লোকগীতি গায়, অনেক নামীদামী শিল্পীর কণ্ঠও তো এতো ভালো নয়। লোকটি ভালোভাবে দুচার বার শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার পর বলল, ভাই সাহেব এবার আপনাকে একটা নতুন গান শুনাব।

কিন্তু আপনার শরীর তো ভালো নয়। থাক, আজ আর গান শোনানোর দরকার নেই।

ও কিছু না। শরীর তো একটু এমন তেমন করবেই। মানুষের শরীরই তো শত্রু ভাই সাহেব। কিন্তুক গান গাইতে না পারলে মনটাও যে মরে যাবি।

আমি আর কিছু বললাম না। সে গান শুরু করল – মাটির ঘরে খাঁটি সোনা রাখব কোন ছায়ায়, ঘরের ভিতর সাপ ঢুকেছে এবার পরান রাখা দায়। সে ঘরের এক কুঠুরি বন্ধ থাকে এক

কুঠুরি খোলা, জানলা দরজা নেই সে ঘরে মাঝি আপন ভোলা, আমি বিনা সুতার মালা গেঁথে আছি কার আশায়, এবার পরান রাখা দায় –

আমি মন দিয়ে শুনছিলাম, গানের বাণীটা সত্যিই নতুন ঠেকছিল। আগে শুনেছি বলে তো মনেই হলো না, কার গান তাও অনুমান করতে পারলাম না। আমি চোখ বন্ধ করে শুনছি, গান যখন শেষের পথে হঠাৎ লোকটি প্রচণ্ড কাশি দিয়ে থেমে গেল, তারপর গলা ফাটানো কয়েকটা কাশি দিয়ে সে একেবারে শুয়ে পড়ল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পাশে গিয়ে দেখলাম অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। এখন কী করা যায় কিছু বুঝতে পারছিলাম না। লোকটির কোথায় বাড়ি কী নাম কিছুই তো জানি না। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম রাস্তার পাশেই মাঠে একটি লোক কাজ করছে, তাকে ডাকতেই লোকটি ছুটে এলো। বললাম এই গায়েনকে কি আপনি চেনেন?

জ্বে, সায়েব আলী গায়েন।

বাড়ি কোথায়?

লোকটি হাত ইশারা করে দেখাল, ঐ যে গ্রাম দেখতেছেন, উর শেষ মাতায়। কী হয়চে?

গান গাইতে গাইতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এখন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী করব।

উর অসুখ আচে। আপনে চিন্তা করবেন না, আমি একটা রিকশা ডাকে আনি।

লোকটি বেশ সহৃদয়। আমাকে আশ্বস্ত করেই সে তাড়াতাড়ি একটা রিকশা নিয়ে এলো। রিকশাওয়ালাও দেখলাম গায়েনকে চেনে। বুঝলাম এ অঞ্চলের মানুষ সবাই তাকে চেনে। আমরা যখন রিকশায় উঠানোর জন্য তাকে ধরলাম, সে আস্তে চোখ মেলে তাকাল। বলল ভাই সাহেব, ধরা লাগবে না। আমি একাই উঠতে পারব।

বুঝলাম সে একেবারে জ্ঞানহারা হয় নাই, তবু তার হাতটা ধরে রিকশায় উঠতে সাহায্য করলাম। তারপর নিজেও পাশে উঠে বসলাম। আমাকে উঠতে দেখে সে আবার আস্তে করে বলল, ভাই সাহেব আপনে কষ্ট করতিচেন, আমি একাই যেতে পারব।

আমি বললাম, না আমার কোন কষ্ট হবে না। আর তাছাড়া আমি তো গ্রামের মধ্যেই যাব।

অল্পক্ষণের ভিতর লোকটি অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে উঠল। রিকশায় ওঠার পর সে যেভাবে হুডের সাথে ঠ্যাস দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল, এখন বেশ সোজা হয়ে বসল। বললাম, আপনার অসুখ কি আগে থেকেই নাকি হঠাৎ করে এমন হয়েছে?

অসুখ তো আমার চিরসাথী ভাই সাহেব। তারপর হাতের

মাটির ঘরে খাঁটি সোনা রাখব কোন ছায়ায়, ঘরের ভিতর সাপ ঢুকেছে এবার পরান রাখা দায়। সে ঘরের এক কুঠুরি বন্ধ থাকে এক কুঠুরি খোলা, জানলা দরজা নেই সে ঘরে মাঝি আপন ভোলা, আমি বিনা সুতার মালা গেঁথে আছি কার আশায়

দোতারার দিকে ইশারা করে বলল, এই শক্রটাকে যেদিন থেকে হাতে নিছি, সেদিন থেকেই অসুখের সাথে আমার পরিচয়।

বুঝলাম এটা তার আক্ষেপের কথা। তার মনটা যে এখন ভালো নাই কথার মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কথা বলতেও বুঝি তার একটু কষ্ট হচ্ছিল। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না।

রিকশা এসে থামল গ্রামের শেষ মাথায়। পথের পাশে বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ের পাশে ছোট একটি কুঁড়ে। আশপাশে বাড়িঘর যেগুলো আছে তা একেবারে কাছে নয়। থমথমে নির্জনতার মধ্যে রিকশা থেকে নেমে আমরা ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসলাম। এখন তার চলতে কোনো সাহায্য লাগল না। রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিতেই সে বিদায় নিল।

দাওয়ার ওপর আধা ছেঁড়া একটা মাদুর পাতা ছিল, তার ওপর বসে আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো মানুষের সাড়া শব্দ পেলাম না। ঘরেও না, বাইরেও না। বললাম, আপনার বাসায় তো কাউকে দেখছি না।

কাকে দেখবেন ভাই সাহেব।

কেন, আপনার কেউ নেই?

আছে। আবার নেইও।

তার কথার রহস্য বুঝতে পারলাম না। অধ্যাত্ম সাধনা যারা করে তাদের কথাবার্তা হাবভাব একটু রহস্যময় হয়। আমরা কথা বলতে বলতেই দেখলাম বারো-চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে কলসি কাঁখে এগিয়ে আসছে। সে দ্রুত পানি ভর্তি কলসি নামিয়ে রেখে লোকটির কাছে এসে হাত- মুখে ইশারায় কিছু একটা জিজ্ঞাসা করল।

গায়েন আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে হাসার চেষ্টা করল। বলল, না, কিছু হয় নাই। তুই বেঁচে থাকতি আমার কিছু হবে না। তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ভাই সাহেব এইটা হলো আমার আশ্রয়।

আপনার মেয়ে?

জ্বে। তয় আমার বলিনে। বলি আল্লার মাল আল্লা আমার হাওলায় দিচে।

ওর মাকে তো দেখছিনে?

ওর মা চলে গেছে ভাই সাহেব। আল্লা ওকে দিয়ে উর মাকে নিয়ে গেচে।

আপনি দ্বিতীয়বার আর কোনো -

না ভাই সাহেব, মন চাইল না। আল্লার ওপর খুব গুসা হলো ভাই সাহেব। আর উসব চিন্তা মাথায় আনলেম না।

ওই ছোট বাচ্চারে আপনি লালন-পালন করতে পারলেন?

সে আবার আরেক কাহিনী ভাই সাহেব। অবস্থা বেগতিক দেখে মেয়েটারে আমি একখানে পালক দিচিলাম। তারপর এক বছর দুই বছর চলে যায় মেয়েটা আমার কথা কয় না। তিন বছরেও ও যখন কথা বলল না, তখন একদিন তারা আমাকে ডেকে নিয়ে দিয়ে দিল। তারপর আর কী করব, এতদিন তো পথে পথে ঘুরছিলাম। তারপর এখান থেকে সেখান থেকে খড়কুটু চেয়ে এনে পথের পাশে এই বাসা বাঁধলাম।

মেয়েটা যে বোবা আমি এতক্ষণও সেটি বুঝতে পারিনি। এতো সুন্দর একটা সৃষ্টির মধ্যে এতো বড় একটা শূন্যতা দেখে মনটা আমার নরম হয়ে গেল। বললাম তিন বছর পর তারা মেয়েটি আপনাকে দিয়ে দিল, কোনো মায়াদয়া হলো না।

মায়াদয়া কুথাও নেই ভাই সাহেব। মাটির পিরথিবীটা দিনদিন পাথর হয়ে যাচ্ছে।

আমি সাথে সাথে আর কিছু বলতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম জীবনটা সত্যিই নির্মম। আমাকে নীরব দেখে সে মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, মা গো বাড়িতে মেহমান আসলে সামনে কিছু দিতে হয়।

মেয়েটি কিছু বলল না, কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে মাথা নিচু করল। আমি অনুমান করলাম ঘরে কিছু নাই। বললাম, না না আমাকে কিছু দিতে হবে না, শুধু এক গ্লাস পানি দিলেই আমি খুশি হব। এরপর আর কিছু বলতে হলো না। মেয়েটি আস্তে গিয়ে কাঁসার গ্লাসে এক গ্লাস পানি নিয়ে এলো। পানি খাওয়া শেষ হলে সে গ্লাসটা নিয়ে চলে গেল, আর সামনে এলো না।

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম, এখন আপনার কেমন লাগছে?

জ্বে ভালো। এখন আর কোনো অসুবিধা নেই। শুধু আপনারে কষ্ট দিলাম।

নাহ আমার কোনো কষ্ট হয় নাই। বলেই তাকে অন্য প্রসঙ্গে ফেরানোর চেষ্টা করলাম। বললাম, আপনি শেষে যে গানটা গাইছিলেন, কার গান।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে মাথা তুলে বলল, এই অধমের ভাই সাহেব।

আপনি নিজে গান লেখেন, সুর দেন?

লিখতে তো পারি না ভাই সাহেব, মনের মধ্যে সাজাই। একটা করে সাজাই, কিছুদিন গাই, আবার ভুলে যাই। আমার মনও আমার শত্রু ভাই সাহেব। কোনো কতা বেশিদিন মনে রাখপের পারিনে।

কিন্তু তাই বলে আপনি এই ভাবে আপনার সৃষ্টিকে হারিয়ে ফেলছেন। না হয় অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে রাখতেন, কিংবা অন্য কাউকে শিখিয়ে দিতেন।

সময় কুথায় ভাই সাহেব। পরের জন্যি পথে পথে গান গায়ে বেড়াই, নিজের জন্যি আর সময় হয় না।

আপনি গান গাওয়াকে পেশা হিসেবে না নিয়ে, অন্য কাজকাম করেও তো গানের চর্চা করতে পারতেন।

পারি নাই ভাই সাহেব। সে চেষ্টাও করিচিলেম। বিয়ের পর দোতারা ফেলে নাঙলের গুটি হাতে ধরছিলেম। কিন্তুক মন মানতি পারলেম না। যখন জমিতে হাল চষতেম, মাটির দিকে মন থাকত না, মনটা পথে পথে ঘুরে বেড়াত। তবু যতদিন বউ বাচে ছিল, লাঙলের গুটিই হাতে ধরে ছিলাম, তারপর বউ মরে গেল, আমিও লাঙলের গুটি ফেলে দোতারা হাতে পথে বাড়ায়ে পড়লেম। এই পর্যন্ত বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর বলল, সুর একবার যার মনে ধরে, তারে দিয়ে ঘরসংসার হয় না ভাই সাহেব।

কথাটি আমার কাছে একেবারে নতুন নয়, কিন্তু তবু এর সত্যতা আগে কখনো এতো নির্মমভাবে প্রত্যক্ষ করিনি। তাই এই মুহূর্তে কথাটি যেন আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম। কিছুক্ষণ নীরবতার পর বললাম, আমি যদি আপনাকে ঢাকা নিয়ে যাই, যাবেন?

না, ভাই সাহেব।

কেন?

আর কী লাভ হবি। জীবনের বারো আনা তো চলেই গেছে, এহন আর কোনো কিছু ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি চলে গেলি আমার আশ্রয় তো নিরাশ্রয় হয়ে যাবি।

বুঝলাম সে তার মেয়ের কথা বলছে। আমি সাথে সাথে আর কিছু বলতে পারলাম না। এই সময় মেয়েটি মাটির সানকিতে কিছু মুড়ি এনে আমাদের সামনে রাখল। তারপর হাসিমুখে আমাকে খাওয়ার জন্য ইশারা করল। আমি গভীর মমতায় তার মাথার ওপর হাত রাখলাম। এরপর সে তাড়াতাড়ি পানি আনতে চলে গেল।

গায়েনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। অনুমান করলাম, এ মুড়ি কোথা থেকে এলো সে জানে না। মেয়েটি চলে যেতেই সে বলল, ভাই সাহেব খান। গরিবের দুয়ার। আপনাকে উপযুক্ত সম্মান করার শক্তি তো আমার নাই। বাপ সখ করে নাম রাখছিলে সাহেব আলী, আর এখন আমি হইছি পথের ফকির।

আমি কিছুই বললাম না, আস্তে মুড়ি হাতে নিয়ে মুখে দিলাম। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলাম। তিনটা বাজতে চলেছে। সময় যে কোন দিক দিয়ে চলে গেছে বুঝতেই পারিনি। সঙ্গী দুজনের কথাও একবার মনে পড়েনি। এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে তারা হয়তো চলেই গেছে। তাড়াতাড়ি পানি খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। পকেট থেকে মানি ব্যাগ বের করে এক শ টাকার একটা নোট গায়েনের হাতে দিলাম।

সে নোটটি হাতে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল কিসের টাকা ভাই সাহেব।

টাকা আবার কিসের হবে, এমনি টাকাটা আমি আপনাকে দিলাম। তা ছাড়া সকালে আপনার গান শুনলাম, কিছুই তো দেয়া হয়নি।

ভাই সাহেব আজ তো আপনাকে আমি পয়সার জন্যি গান শুনাই নাই।

না, ঠিক আছে। তবু টাকাটা আমি এমনি আপনাকে দিতে চাই।

সে নরম গলায় বলল, এমনি টাকা নিতি লজ্জা করে ভাই সাহেব।

এরপর আমি কী বলব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। বললাম, আমি খুশি হয়ে আপনার মেয়েকে টাকাটা দিলাম।

কথাটা শুনে সে আবারো ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু আর কিছু বলল না।

পথ দিয়ে চলতে চলতে মনের মধ্যে নানান কথা ঘনিয়ে উঠল। কী নির্মম জীবন মানুষের। এখন বেলা তিনটে বাজে, অথচ ঘরে কোনো খাবার নেই। বোবা অসহায় একটি মেয়ে, আর রুগ্ন একটি মানুষ না জানি আরো কখন থেকে অভুক্ত আছে। একজন সুরসাধকের জীবনের এই পরিণতি দেখে আমার জীবনের প্রতি আসক্তি কমে গেল। ভেবেছিলাম গ্রাম বুঝি কেবলই সুন্দর। আর এতোদিন দূর থেকে কেবল সেই সৌন্দর্যই দেখে এসেছি, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের গভীরে যে কত বড় রক্তপাত চলছে এখানে না আসলে হয়তো আমার তা দেখাই হতো না।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখলাম সত্যি তাজুল এবং ইউনুস নেই। এতক্ষণ আসলে থাকার কথা নয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরাও হয়তো ভেবেছে আমি কোনো কারণে চলে গিয়ে থাকব।

রেস্ট হাউসে ফিরে দেখলাম তাজুল আর ইউনুস আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখেই তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল, স্যার, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

তাদের উৎকণ্ঠার অনুপাতে ঠাণ্ডা অভিব্যক্তিতে বললাম, গ্রামেই ছিলাম।

এবার তারা আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল, স্যার আমরা তো ভেবেছি আপনি চলে এসেছেন। আমরা স্যার বাসস্ট্যান্ডে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি।

না ঠিক আছে, আপনারা ঠিকই ভেবেছেন। আমারই একটু অধিক বিলম্ব হয়ে গেছে।

এতক্ষণে মনে হলো তারা কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। বলল, কেন বিলম্ব হয়েছে স্যার, কোনো বিপদ-আপদ নয়তো?

না, তেমন কিছু নয়। পরে বলব। আপনারা ফিরে এসে তো বাড়িতেও যাওয়া হয়নি, কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত মুখ ধোয়া, খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয়নি। এখন বাড়িতে যান। বিশ্রাম করুন গে।

পরদিন থেকে ভীষণভাবে কাজে জড়িয়ে গেলাম। অর্ধেক সময় পার হয়ে গেছে, কোনো কাজই হয় নাই। অনেকগুলো ফাইল জড়ো করেছে তাজুল আর ইউনুস। দিনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওদের সাথে ফিল্ডে থাকতে হচ্ছে। বিকেলে একটু বিশ্রাম। তারপর আবার সন্ধ্যা থেকে ফাইল নিয়ে বসা।

এর মধ্যে আর সাহেব আলী গায়েনের সঙ্গে দেখা হয় নাই। একদিন ফিল্ড ওয়ার্কে যাওয়ার সময় ইচ্ছা করেই তার বাড়ির পাশ দিয়ে গেলাম, কিন্তু দেখা হলো না। মেয়েটিও বাসায় ছিল না। ঘরের দরোজায় দেখলাম ছোট্ট একটি তালা ঝুলছে।

আস্তে আস্তে আবার যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। সেদিন গায়েনের সঙ্গে কথা হয়েছিল সে আমাকে একটা দোতারা বানিয়ে দেবে। আমি দোতারা বাজানো জানিনে, টুকটাক হারমোনিয়াম বাজাতে পারি, তবু গায়েনের হাতে দোতারার সুর শুনে যন্ত্রটার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা জন্মে গেছে।

এখন বেলা তিনটে বাজে, অথচ ঘরে কোনো খাবার নেই। বোবা অসহায় একটি মেয়ে, আর রুগ্ন একটি মানুষ না জানি আরো কখন থেকে অভুক্ত আছে। একজন সুরসাধকের জীবনের এই পরিণতি দেখে আমার জীবনের প্রতি আসক্তি কমে গেল।

যাবার আগের দিন শেষবারের মতো যখন ফিল্ডে গেলাম তখন একটু সময় নিয়ে গায়েনের বাসায় গেলাম। কিন্তু আজও তার দেখা পেলাম না। মেয়েটাকে পেলাম। আমাকে দেখেই সে হাসতে হাসতে সেই ছেঁড়া মাদুরটা দাওয়ায় বিছিয়ে দিল। হাতে বসার সময় ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ইশারায় তার সঙ্গে যা কথা হলো তার অর্থ দাঁড়ালো এই, তার বাবা দূরে গেছে গান গাইতে, কখন ফিরবে তার কোনো ঠিক নেই।

আমি কিছু খাবার আর কাপড়-চোপড় সাথে নিয়েছিলাম, তার সাথে এক শ টাকার একটি নোট মেয়েটির হাতে দিয়ে বিদায় নিলাম। মেয়েটি হাসতে হাসতে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানাল। ইশারা করে বলল, আবার আসবেন।

শেষের দিকে একটু তাড়াহুড়ো হলেও কাজ-কর্ম সব সুষ্ঠুভাবেই সমাধা হলো। যাবার আগের রাতে তাজুল এবং ইউনুসকে রেস্টহাউসেই দাওয়াত করে খাওয়ালাম। ওরা খুশী হলো। পরদিন বাসস্ট্যান্ডে এসে ওরাই সব তুলে পেতে ঠিক করে দিল।

ঢাকা ফিরে আবার সেই ফ্রেমে বাঁধা জীবন। সকাল-বিকাল অফিস, আড্ডা, ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরা, ঘুম, আবার অফিস। ঘড়ির দাগের সাথে জীবনের সব চাওয়া-পাওয়াও যেন দাগ মিলানো।

এরপর বছরখানেক পরের কথা। অফিসে প্রচণ্ড কাজের চাপ। দুপুরের পর নিজের কামরায় বসে কাজ করছি। টেবিল থেকে মাথা তোলার সময় নেই। পিয়ন ঢুকে বলল, স্যার গ্রাম থেকে একটি লোক এসেছে, আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

আমি আশ্চর্য হয়ে টেবিল থেকে মাথা তুললাম, গ্রাম থেকে লোক এসেছে, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। গ্রাম থেকে তো আমার কাছে কেউ আসার নেই। বললাম, ঠিক আছে নিয়ে এসো।

পিওন বেরিয়ে গেল, তারপর দেখলাম তার পিছনে পিছনে ঢুকছে সাহেব আলী গায়েন। কয়েক মুহূর্ত লাগল চিনতে, অবিকল তেমনই আছে। আমি উঠে তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে সামনের চেয়ারটায় বসালাম। বললাম, আপনি, এতোদিন পর, চিনলেন কিভাবে?

সে বলল, পথই যাদের ঠিকানা পথ চিনতে তাদের অসুবিধে হয় না ভাই সাহেব।

দেখলাম সেই একই রকম রহস্যময় বাক্য। আমাকে কথাটা বলে সে পকেট থেকে মলিন একটি ভিজিটিং কার্ড বের করে এগিয়ে দিল। তারপর বলল, মানুষকে দেখাতি দেখাতি চলে এলাম।

মনে পড়ল কার্ডটা আমিই তাকে দিয়েছিলাম, দরকার হলে যোগাযোগ করার জন্য। তারপর কী মনে করে বলুন।

সাথে সাথে সে কিছু বলল না। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে খবরের কাগজে মোড়া একটা কিছু বের করে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর বলল, আপনার দোতারা। অনেক দেরি হয়ে গেল।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনি এতো কষ্ট করে এতোদূর থেকে এই দোতারা নিয়ে এসেছেন।

কথা দিয়েছিলাম ভাই সাহেব, কথা না রাখলি জবান তো নাপাক হয়ে যাবি।

মনে মনে ভাবলাম, একজন অশিক্ষিত মানুষের কাছে কথার এতো দাম, আর আমরা প্রতিদিন কত কথা খেলাপ করছি। এতক্ষণে আমার মনে পড়ল তার মেয়েটির কথা। নামটা মনে করতে পারলাম না। শুনে থাকলেও মনে নেই। বললাম আপনার আশ্রয় কেমন আছে। সাথে সাথে সে কিছু বলল না। কয়েক মুহূর্ত কিছু একটা ভেবে বলল, আমার আশ্রয় ভেঙে গিছে ভাই সাহেব।

আমি তার কথাটা ঠিক বুঝলাম না, বললাম, আমি আপনার মেয়ের কথা বলছি।

জ্বে আমি বুঝতে পারছি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবারো সে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল, আমার আশ্রয় নিরাশ্রয় হয়ে গেছে।

মানে? আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে তার দিকে ঝুঁকে পড়লাম, বললাম কী হয়েছে?

কী বলব ভাই সাহেব, মানুষ ক্যামনে পশু হয়ে যায়। এই পর্যন্ত বলে সে চুপচাপ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইল।

তারপর কাঁপা কাঁপা আহত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে ঘটনাটি বলল।

অন্যদিনের মতোই সেদিন সে দূরে গিয়েছিল গান করতে। ফিরতে একটু রাত হয়েছিল। এই সুযোগে গ্রামেরই একটি পশু জোরপূর্বক তার মেয়েটির সম্ভ্রম নষ্ট করে। বোবার চিৎকারে আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে, কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। পশুটিকেও আর ধরা যায় নাই। তারপর লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে একদিন রাতের আঁধারে মেয়েটা কোথায় চলে গেল, আজ পর্যন্ত তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

এই পর্যন্ত বলে সে কিছুক্ষণ নীরবে মাথা নিচু করে রইল। আমিও কী বলব কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। লোকটি উঠে দাঁড়াল, বলল, ইবার তাহলে আসি ভাই সাহেব।

আমি তাড়াতাড়ি করে বললাম, আপনি আমার কাছে কয়েকটা দিন থাকেন, আমি আপনাকে রেডিও, টেলিভিশনে নিয়ে যাব, কোনো অসুবিধা হবে না।

অসুবিধা আর কী হবি ভাই সাহেব, একটা প্যাড একটা শরীর, কুকুর বিড়ালের যে অসুবিধা আছে, আমার তো এখন তাও নাই। পথে যখন আশ্রয় নিচি তখন বাকি জীবনটা পথে পথেই কাটায়ে দিতি চাই, কুনোদিন যদি আমার আশ্রয়ের সাথে দেখা হয়ে যায়। এই পর্যন্ত বলে সে একটু থামল, তারপর বলল, আমাক আর লোভ দেখাবেন না ভাই সাহেব।

আমিও আর কিছু বলতে পারলাম না। ভেবেছিলাম একটা গান গাইতে বলব, তাও বলতে পারলাম না। সে আমাকে হাত তুলে ছালাম জানিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসলাম। দেখলাম টেবিলের ওপর খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেটটি বোবা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

লেখক মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের বাংলা বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক। গল্পটি কলি প্রকাশনীর 'পাবনার গল্পকার ও গল্পসংগ্রহ' বই থেকে এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।

শিশুদের ভালোভাবে পড়ানোর কৌশল আমার অভিজ্ঞতা

জোছনা আক্তার

শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদেরকে দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে শিক্ষা। শিশুর মনে সব বিষয়ে জানার প্রবল আগ্রহ। পৃথিবীর সকল বিষয়ে তারা জানতে চায়। এ জগতের সকল বিষয় তাদের কাছে রহস্যময়। কিন্তু শিশু কখন কি করতে পছন্দ করে তা না জানলে তাকে শিক্ষাদান কষ্টদায়ক। আমরা সবাই জানি যে শিশুদের মন নরম কাদামাটির মতো। শিশুকে যত্নের সাথে আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষাদান করলে তার মনের বিকাশ হয়। একদিন এই শিশুরা বড় হয়ে সমাজ ও দেশ পরিচালনায়, গবেষণায়, সৃষ্টিশীল কাজে নিয়োজিত হবে।

সিদীপ শিক্ষাকেন্দ্রে যেসব শিক্ষার্থী রয়েছে তারা মা-বাবা ও ভাই-বোনদের থেকে পড়ালেখার কোন সুবিধা পায় না। কারণ তারা অক্ষরজ্ঞানহীন। যার কারণে তারা বিদ্যালয়ের পড়া শিখে যেতে পারে না। তাছাড়া তাদের গৃহশিক্ষক রাখার সামর্থ্য নেই। আমি তাদের সার্থক ও যথার্থ পাঠদানে নিম্নরূপ কৌশল অবলম্বন করি।

কুশল বিনিময়: আমি যে স্থানে শিশুদের চটে বসিয়ে পড়াই সে স্থানে প্রবেশ করে শিশুদের সংগে সালাম বিনিময় করে থাকি। এরপর সকলের স্বাস্থ্য-মন কেমন আছে, কি খেয়েছে বা খেয়েছে কিনা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করি। কোন শিক্ষার্থী অসুস্থ থাকলে তার খবর নিয়ে থাকি। সকল শিক্ষার্থীর নিকটে গিয়ে আদর দিয়ে মিষ্টি ভাষায় মাতৃস্নেহে কুশলাদি জিজ্ঞেস করি। যেসব শিক্ষার্থী চুপচাপ থাকে বা কম কথা বলে তাদের কাছে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে কুশলাদি বিনিময় করি।

নিরাপদ পরিবেশ: আমি সকল শিক্ষার্থীকে আনন্দদায়ক নিরাপত্তামূলক পরিবেশে শিক্ষা দেই। এতে শিক্ষার্থীরা খুশির সাথে পড়ালেখা করে। আর আমি ক্লাসে কখনো বেত ব্যবহার করি না। তবে পড়ানোর সুবিধার্থে নির্দেশনা কাঠি ব্যবহার করে থাকি।

শ্রেণিবিন্যাস: সাধারণত শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অনুযায়ী বসিয়ে শ্রেণিবিন্যাস করে থাকি। কয়েকদিন দেখানোর পর ঠিক হয়ে যায়, তবুও মাঝে মাঝে খেয়াল রাখতে হয়।

শিশুরা বিভিন্নভাবে শিখে: শিশুরা বিভিন্নভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে। কখনো সে কোন কিছু দেখে শিখে, কখনো নেড়েচেড়ে শিখতে পছন্দ করে। কখনো ছুঁয়ে শিখে, কখনো আবার সুর করে গানের মাধ্যমে শিখতে চায়। কখনো একা একা কাজ করে শিখে, আবার কখনো দলে অন্যদের মাধ্যমে শিখতে চায়। তারা শুনে, পড়ার মাধ্যমে, লিখে, বলতে বলতে, অনুকরণ করে, অনুসরণ করে ইত্যাদির মাধ্যমে শিখে। খেলে, বিনোদনের মাধ্যমে, ভ্রমণের মাধ্যমে ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখে তারা। শিক্ষাদা-নের সময় আমি শিশুর এ দিকটি লক্ষ্য রাখি।

শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার: আমি চক, বোর্ড, হাজিরা খাতা, নির্দেশনা কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করি।

হাজিরা ডাকা: শ্রেণিবিন্যাস শেষে ছাত্রছাত্রীর দৈনিক হাজিরা ডেকে উপস্থিত থাকলে খাতায় P এবং অনুপস্থিত থাকলে A দিয়ে থাকি। অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর খবর নিই। কোন শিক্ষার্থী ছুটি চাইলে কারণ জেনে তাকে ছুটি দিই কেননা ছোট শিশুদের মনের উপর জোর চালানো যায় না।

আবেগ সৃষ্টি: মনকে প্রফুল্ল রাখতে খুব অল্প সময় ব্যয় করে গান, ছড়া, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি করে শিশুদের পড়ার মাধ্যমে আবেগ সৃষ্টি করি।

প্রশ্ন করার কৌশল: আমি প্রশ্ন করবার পর চিন্তা করার সুযোগ দিই এবং যারা কম কথা বলে তাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করি। যে শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারল না তাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বালি এবং তারপর বলার জন্য বলি।

ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আচরণ: আমি আমার আচার-আচরণের দিকে লক্ষ্য রাখি যেন আমার কোন খারাপ আচরণে শিশুদের মন খারাপ না হয়। শিশুরা শিক্ষিকার চালচলন, পোষাক-আষাক, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি অনুসরণ করে। তাই এ ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সজাগ থাকি।

সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমদৃষ্টি: সকল শিশুকে একইভাবে পড়াই এবং সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করি। সবার প্রতি একই দৃষ্টি রাখি যাতে কারো মনে কষ্ট না হয়।

পূর্বজ্ঞান যাচাই: শিক্ষার্থীদের যে পড়া বিদ্যালয়ে দেয়া হয় তা তৈরি করতে গিয়ে তাদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করি। শিক্ষার্থী মনে করে তার সাথে গল্প করছি, কিন্তু আমি আসলে পাঠ সংশ্লিষ্ট গল্প করতে করতে পড়ার মধ্যে চলে যাই।

উৎসাহ ও ধন্যবাদ প্রদানের কৌশল: শিক্ষার্থীরা বাহবা বা উৎসাহ পেলে খুব খুশি হয়। তাই আমি তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে থাকি। কেউ কিছু পারলে তাকে ধন্যবাদ দিই।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীরা শিখন ফল অর্জন করলো কিনা জানার জন্য বারবার পড়ানো ও লেখানোর মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে থাকি।

সময় সচেতনতা: সময় হচ্ছে জীবনের বহু মূল্যবান সম্পদ। তাই আমি নিয়ম অনুযায়ী ৩.০০-৫.০০টা এই ২ ঘণ্টা সময় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিই। আর সময়মতো পড়ানো শুরু করি।

বর্ণ শেখানো: ভালো করে শিখানোর জন্য আমি কার্ডে বর্ণ লিখে নিয়ে আসি। এরপর বোর্ডের মাঝখানে কার্ডটি রেখে প্রতিটি শিশুকে মুখে মুখে প্রথমে পড়াই। সকলে অ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি দেখে বলতে পারলে কার্ডের অপর পাতায় সাইন কলম দিয়ে অ-তে কি হয়, ই-তে কি হয়, ঈ-তে কি হয় লিখি। এভাবে তারা বর্ণ চিনলে তাদেরকে অক্ষর লেখা শেখাই।

বর্ণলেখা: আমি বোর্ডের মাঝে ১টি বর্ণ লিখি। এর উপর শিশুদের হাত ঘুরাতে বলি। আবার তা খাতায় অনুশীলন করাই।

সংখ্যা শিখানো: প্রতিটি শিশু যেন ভালভাবে শিখতে পারে তাই আমি ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করে অপর পাতায় সাইন পেন দিয়ে ১ – ১০০ পর্যন্ত লিখে নিয়ে আসি ও তাদেরকে শিখাই। বীচি বা কাঠি দিয়ে শিক্ষার্থীকে বলি এখানে কয়টি সিমের বীচি আছে বা কয়টি কাঠি আছে। তারপর ১টি বীচি নিয়ে ১ বলা শিখাই। আবার ২টি বীচি নিয়ে ২ শিখাই। এরপর ১টি কাঠি নিয়ে ১ শিখাই ও ২টি কাঠি নিয়ে ২ শিখাই। এরপর ৩, ৪, ৫ শেখাই। বইয়ের মাঝে ছবি দেখিয়ে বলি এখানে কয়টি ছবি। আবার ফুল দেখিয়ে বলি এখানে কয়টি ফুল। হাতের আঙুল, মারবেল ইতাদি দিয়েও শেখাই। আবার আমি সংখ্যার ছড়া ব্যবহার করি। যেমন: ১ আর ২/জবা আর জুঁই/৩ আর ৪/মায়ের গলার হার/৯ আর ১০/খেজুরের রস।

এভাবে তারা সংখ্যা গণনা শেখে।

একক ও দলীয় কাজ করানো: আমি একটি পাঠ পড়ানোর পর কখনো একক আবার কখনো জোড়ায় জোড়ায় বা ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়ে থাকি। এতে করে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিলে দলের একজন লিখে ও অন্যরা তাকে সাহায্য করে। পরে আমি ভুল-শুদ্ধ দেখিয়ে দিই।

প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গঠন: প্রত্যেক শিক্ষার্থী কোন না কোন প্রতিভার অধিকারী। তাই আমি তাদেরকে একক ও দলীয় কাজে নম্বর প্রদান করে থাকি। নম্বর প্রাপ্তির আশায় তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে।

শব্দ ও বানান শিখানোর কৌশল: গল্প বা কবিতা পড়ার পর শব্দটির বানান শিখাই। শব্দটি বোর্ডের বাম পাশে উপরে লিখে ২–৩ বার শুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়াই। তারপর আমার সাথে সকল শিক্ষার্থীকে শব্দটি বানান করতে বলি এবং এইভাবে শব্দার্থ ও যে কোন শব্দের বানান শিখাই।

কবিতা পড়ানো: আমি কবিতা ছন্দের তাল ঠিক রেখে ১–২ বার পড়ে শুনাই। তারপর সকল শিক্ষার্থীকে আমার সাথে কবিতার অংশটি ৫–৬ বার পড়তে বলি। এরপর কবিতা ও কবির নাম বোর্ডে লিখে উচ্চারণ করে বানান ও অর্থ শিখাই। এরপর কবিতার সারমর্ম শিখাই।

অংক শেখানো: ছবি এঁকে শিক্ষার্থীদের তাড়াতাড়ি মনোযোগী করা যায়। একইভাবে ছবি এঁকে বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি শেখাই।

স্বাস্থ্য সচেতনতা: পড়ালেখার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সম্পর্কে টিপস দিই যাতে সকল শিক্ষার্থী সুস্থ থাকতে পারে এবং পড়ালেখা ভালভাবে করতে পারে। প্রতিদিন সকল শিক্ষার্থীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে আসার জন্য বলি। নতুন কোন জামা বা সার্টের প্রয়োজন নেই। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরতে হবে, মাথার চুল ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রতিদিন সকালে দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। আমি প্রতি বৃহস্পতিবারে সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বলি টয়লেট থেকে এসে সাবান বা ছাই দিয়ে হাত ধুতে হবে। শিক্ষার্থীর হাত, পা, নখ কেটেছে কিনা জিজ্ঞেস করি। তাছাড়া সকল শিক্ষার্থীকে বলি – স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।

সাধারণ জ্ঞান: আমি প্রতি বৃহস্পতিবারে সকল শিক্ষার্থীকে সাধারণ জ্ঞান দিই। প্রথমে বলি আমাদের দেশের নাম কি। সবাইকে বলি – বাংলাদেশ। এরপর আমাদের রাজধানী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। বলি, ঢাকা আমাদের রাজধানী। এরপর জাতীয় মাছের নাম জিজ্ঞেস করি। বলি, ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। জাতীয় পাখির নাম দোয়েল বলে দিই। জাতীয় ফুলের নাম, জাতীয় ফলের নাম ইত্যাদিও শেখাই। জাতীয় সঙ্গীত কে লিখেছেন তা বলি এবং জাতীয় সঙ্গীত শেখাই। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে বলি।

সকল শিক্ষার্থীকে তার বাবা-মার নাম, গ্রাম, ডাকঘর, জেলা, উপজেলা ইত্যাদি শিখিয়ে দিই। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম শিখাই। আবার সকলকে বিভিন্ন ফুল, ফল, মাছ, দেশ ইত্যাদির নাম শেখাই।

সাংস্কৃতিক চর্চা: পড়ালেখা শেষে প্রতিদিন কিছুটা সময় ব্যয় করে ছবি আঁকা, গান, ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করাই।

আমরা খুব সীমিত সম্মানী পেলেও গরিব-অসহায় শিশুদেরকে শিক্ষা দিতে পারছি বলে আমার নিজের কাছে খুব ভাল লাগে। যখন আমি আমার কোন শিক্ষার্থীর খবর নিতে যাই, তখন সবাই ম্যাডাম বলে ডাকে, তখন নিজেকে খুব গর্বিত মনে হয়। মনে হয় গরিব-অসহায় শিশুদের জন্য অন্তত কিছু করতে পারছি।

লেখক চট্টগ্রামে বারইয়ারহাট অঞ্চলের কালিদহ-লেমুয়া শাখায় একটি সিদীপ শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকা। তিনি রচনা-প্রতিযোগিতা ২০১৩-এ বিজয়ীদের একজন।

Caption: Two Women Media : Oil on canvas Size : 36"X 30"

Caption : No more war, save humanity Media : Oil on canvas

অন্তর্গত ভাবনা ও মাটির ঘ্রাণময় চিত্রপ্রদর্শনী

আলমগীর খান

নিজেদের 'ভাবনা, ধরন, মনন ও বিচিন্তা' যাতে 'এক নিতান্ত খোলামেলা অবকাশ' পায় – এই চিন্তায় একদল চিত্রশিল্পী SPACE-এ জড়ো হন। ঢাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আর্ট গ্যালারিতে ৯ থেকে ২৪ জানুয়ারি তাদের চিত্রকর্ম নিয়ে একটি প্রদর্শনী হয়। বিভিন্ন শিল্পীর এসব ছবিতে যেমন তাদের অন্তর্গত মনোভাবের প্রকাশ ছিল, তেমনি ছিল বাংলার প্রকৃতি ও ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অংশ।

Human Play Media Water Colo 56cm X 72cm

আফরোজা আক্তারী বিউটি তার অ্যাক্রিলিকে আঁকা 'বসন্ত', 'বৃষ্টির দিন' প্রভৃতি ছবিতে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষের বিশেষত নারীর অভূতপূর্ব অভিব্যক্তি ও উচ্ছসিত ভঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। খুরশিদা আখতার ও মোকাররম হোসেন হীরনের তেলরঙ ছবিতে জীবনের ফেলে আসা কিছু সময়ের পুনর্জীবন ঘটেছে। অ্যাক্রিলিকে ফারজানা ইয়াসমিনের 'প্রকৃতি' শীর্ষক ছবিগুলোয় প্রকৃতির স্পন্দন অনুভব হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে' শীর্ষক ছবিটি। এতে আছে জাতীয় পতাকার সবুজ প্রেক্ষাপটে লাল ফুলের মাঝে একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ যা বাংলাদেশের জন্মলাভের সঙ্গে একটি অপূর্ব সাদৃশ্য বহন করে।

রফিক সিদ্দিকীর '১৯৭১' শীর্ষক তেলরঙ ছবিসমূহ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনার চমৎকার চিত্রায়ন। একটি ছবিতে পাকিস্তানি সৈন্য বা তার দোসরদের দ্বারা অত্যাচারিত এক নারীকে ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। ফাঁসির দড়ির উপর লাল সূর্য অত্যাচারিত মানবতার বিজয় ঘোষণা করে। আরেকটি ছবিতে পাকিস্তানিদের দ্বারা ভেঙে ফেলা ও পুড়িয়ে দেওয়া একটি বাড়ি তার দ্রোহ নিয়ে উপস্থিত। 'আর যুদ্ধ নয়, মানবতা রক্ষা করো' শীর্ষক ছবিতে চারদিক অভিমুখে সঙ্গিন উঁচিয়ে থাকা বহু মানবাকৃতি মিলিয়ে একটি আর্ত মানবতার প্রকাশ।

শাহ মঈনুল ইসলামের কালি-কলমের অনাড়ম্বর ছোঁয়ায় ফুটে উঠেছে জীবন-ভাবনার বৈচিত্র্য। মুক্তারুন নাহার নাজমার ছবিতে এসেছে ছায়ানিবিড় বাংলাদেশ। জলরঙে শিশির মল্লিক নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও মানবজীবনের সঙ্গে বৃক্ষের সাদৃশ্য খুঁজেছেন। নুরুন নাহার সহজ-সুন্দর রাখাল জীবনের ছবি এঁকেছেন। রোমান ভুঁইয়া, বিজন কুমার মজুমদার, অবশ কুমার ইন্দু, মহিউদ্দিন আহমদ, উত্তম কুমার তালুকদার, জয় সুন্দর, শেখর মণ্ডল, মাহফুজা বিউটি প্রমুখ শিল্পীর আপনাপন কথার পরও সব মিলিয়ে যেন একটি হৃদয়েরই চিত্রবিচিত্র অনুভূতি ফুটে উঠেছে। স্পেস অন্তর্গত ভাবনা এবং দেশ ও মাটির ঘ্রাণ মিশিয়ে দিয়েছে তাদের এ প্রদর্শনীতে।

একালের খাওয়া দাওয়া

আশরাফ আহমেদ

খান সাহেবরা 'খান, গল্প করেন আবার খান। দেখিতে দেখিতে বেলা দুইটার মধ্যে খাসি শেষ হইয়া গেল।' ষাটের দশকে স্কুলে পড়ার সময় আমাদের দ্রুতপঠন বইতে 'সেকালের খাওয়া দাওয়া' নামে একটি লেখায় এই বাক্যটির ভাব-সম্প্রসারণ শিখে মুখস্থ লিখতে হতো। এটির লেখক কে ছিলেন তা আর মনে নেই। তবে আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বাংলাদেশে খাদ্যের অপ্রতুলতার কথা মনে রেখেই হয়তো তিনি তাঁর বাল্য-শিশুকালে বা 'সেকালের' অবস্থাপন্ন লোকদের বিলাসী খাওয়া-দাওয়ার বর্ণনা শুধু একটি খাসির মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। অর্থাৎ সেই 'স্বর্ণযুগে' দুইজন ধনী ব্যক্তি কয়েক ঘণ্টার মাঝেই একটি খাসি সাবাড় করে ফেলতে পারতেন! লেখাটিতে আর কোন খাবারের উল্লেখ ছিল বলে মনে পড়ে না, তবে খাসিটির ওজন কত ছিল সেটি নিয়ে বন্ধুদের সাথে অনেক গবেষণা করলেও তার উত্তর আজও মেলেনি!

সেই ষাটের দশক পার হয়ে আশির দশকের গোড়ায়, ১৯৮০ সনে, আমি দেশ ছেড়ে আসি। টের পাইনি কিভাবে দিনে দিনে বত্রিশটি বছর পেরিয়ে গেছে। দুই-চার-পাঁচ বছরে একবার করে দেশে গেলেও গত আড়াই দশকে সাত থেকে দশদিনের বেশি থাকা হয়নি। ফলে ছোটোখাটো পরিবর্তন চোখে পড়লেও সেই ১৯৮০ সনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রাটিই মনে গেঁথে ছিল এতদিন। এবার বাংলাদেশে একনাগাড়ে ছাব্বিশ দিন থাকার ফলে পরিবর্তনগুলো বেশ স্পষ্ট করেই ধরা পড়লো।

আশি সনে সমাজে আমার অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল মধ্যবিত্তের। আর আজ দেশে গিয়ে আমি যে আত্মীয় বন্ধুদের সাথে থাকি, তাঁরা আমার দৃষ্টিতে অনেক ধনী হলেও বাংলাদেশের সমাজে মধ্যবিত্তের গণ্ডি পার হননি। কাজেই আমার চোখে যে পার্থক্যগুলো ধরা পড়েছে তা সারা দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হিসেবে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রা মূল্যায়নে তার কিছু ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে।

মেজভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল কিশোরগঞ্জে ১৯৭৭ সনে। আমরা জনা ত্রিশেক বরযাত্রী নিয়ে গিয়েছিলাম। পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বৌভাত হয়েছিল। বিয়ের অনুষ্ঠান বলতে শুধু এই দুটি প্রধান অনুষ্ঠানই ছিল। এখন প্রতিটি বিয়েতে প্রাথমিক পরিচয় পর্ব, পান-চিনি বা এনগেজমেন্ট পার্টি, ছেলের গায়ে হলুদ, মেয়ের গায়ে হলুদ, বিয়ে ও বৌভাত মিলিয়ে কম করে ছয়টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেজভাইয়ের বৌভাতের মেনুতে ছিল খাসির মাংসের বিরিয়ানি, এক টুকরা মুরগির রোস্ট, বোরহানি এবং জর্দা। এখনকার অনেক বিয়ের মেনুতে এপেটাইজার হিসেবে প্রথমেই আসে ডোবা তেলে ভাজা এক চতুর্থাংশ মুরগি ও ঠাণ্ডা কোক বা স্প্রাইট। মেইন মেনুতে থাকে ঘিয়ে ভাজা এক চতুর্থাংশ মুরগির রোস্ট, কাচ্চি বিরিয়ানি, টিকিয়া কাবাব, মাংসের রেজালা, ভাজি সবজি, সালাদ, বোরহানি, ডেজার্ট হিসেবে আসে পায়েস, পুডিং বা মিষ্টি, আর সবশেষে সুন্দর ছোটো চৌকো একটি বাক্সের ভেতর একটি সুগন্ধি পান। এর বাইরেও সামর্থ্য অনুযায়ী যোগ হয় বড় মাছের বিশাল এক টুকরো ভাজি। অন্যান্য অনুষ্ঠানে অবিকল একই খাবারের ব্যবস্থা না থাকলেও খাবারের মান ও পরিমাণ কোনভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে কম নয়।

মেজভাইয়ের সেই বৌভাতে সর্বাধিক দেড়শত অতিথি সমাগত হয়েছিল। এবার চারটি বিয়ের যে নয়টি অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, তার একটি ছাড়া বাকি সবগুলোতে অতিথির ন্যূনতম সংখ্যা ছিল সাতশো। আগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকতো, সেভাবে মেজভাইয়ের বিয়ে ও বৌভাতের অনুষ্ঠান বাসাতেই হয়েছিল। এখনকার অনুষ্ঠানগুলো সাধারণত কোন কমিউনিটি সেন্টারে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই একসাথে দুইশত লোক টেবিলে বসে খেতে পারেন না বলে দুই থেকে চারটি ব্যাচে খাওয়ার কাজটি সারা হয়।

ঢাকা অফিসার্স ক্লাবে বিয়ের অনুষ্ঠানে একত্রে সাড়ে ছয়শত, আর বঙ্গবন্ধু বা চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে একত্রে সহস্রাধিক অতিথি বসে খেতে পারেন। তবে সেসব জায়গায় আমন্ত্রিত থাকেন আড়াই থেকে সাত হাজার অতিথি। অনেক ক্ষেত্রে শেষোক্ত জায়গার খাবারের মেনুতে আরো পাঁচ থেকে দশ পদের ব্যঞ্জন থাকে বলে শুনেছি। সেদিন খবরে দেখলাম সুদূর নীলফামারীতে এক 'কোটি টাকার বিয়ে'তে ১২ হাজার অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে! অতিথিরা দুই বা তিন ব্যাচে একই টেবিলে খেতে বসেন বলে অনেকেই তাঁদের প্লেটে এতো অধিক পরিমাণ ও রকমের খাবারের অনেকটাই শেষ করতে পারেন না! কাজেই খাবারের অপচয় হয় প্রচুর।

আজকাল দেশের একটি মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত পরিবারে সদস্য সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কম, তিন-চার জন। তা সত্ত্বেও বিয়ের অনুষ্ঠানে আগের চেয়ে এতো অতিথি হওয়ার কারণ কি? প্রথম কারণ আর্থিক সচ্ছলতা। এখনকার মধ্যবিত্ত আগের চেয়ে ঢের বেশি বিত্তশালী। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক স্তর বা স্ট্যাটাস অনুযায়ী এখনকার লোকজনের অন্যের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ আগের চেয়ে অনেক বেশি। তৃতীয় কারণ একজন ভিআইপি বা ভিআইপি সহকর্মীকে দাওয়াত করলে মোট অতিথি হন চার জন - যাকে উপলক্ষ্য করে দাওয়াত করা হলো, তাঁর স্বামী বা স্ত্রী, তাঁর ব্যক্তিগত রক্ষী এবং তার ড্রাইভার। সেই হিসাবে সেদিন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বিয়েতে দাওয়াত করা হয়েছে আড়াই হাজার অতিথিকে!

আমাদের সময়ে কোন উৎসব উপলক্ষ্যে সেমাই, পায়েস বা জর্দার বদলে একটি করে রসগোল্লা বা কালোজাম দিয়ে আপ্যায়ন করলে তা মনে রাখার মত ব্যাপার হতো। এবার এই 'খানদানি' দুটো মিষ্টির চেহারা দেখতে পেলাম না কোন বিয়ের কোন অনুষ্ঠান, বা কারো বাসা, বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মনে হতে পারে যে, বেশি বেশি খেয়ে সবার ডায়াবেটিস হওয়ায় মিষ্টিগুলো আর বানানো হয় না। অথবা চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বা দাম বেড়ে যাওয়ায় এ দুটি মিষ্টি জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অথবা ভেজাল বেশি দেয়ায় লোকজন এ দুটি জিনিসকে বয়কট করছে!

আসলে তার কিছুই নয়। অনেক সুস্বাদু, দর্শনীয় ও জিভে জল আসা মিষ্টি বাজারে এতো বেশি এসে গেছে এবং মানুষের

ক্রয়ক্ষমতার মাঝে চলে এসেছে যে আমাদের সময়কার সেই মিষ্টিগুলো ভদ্রসমাজের ধারেকাছে আর আসতে পারছে না। আগেকার বিখ্যাত 'মরণচাঁদ'-এর স্থান দখল করে নিয়েছে 'রস', 'প্রিমিয়াম' আর 'জয়পুর'-এর মত দামি ব্যবসাগুলো। এদের মিষ্টি প্রতি কেজির দাম তিনশো থেকে তিন হাজার টাকা! আমি চারদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগে গিয়েছি। প্রতিবারই সিংগারা, জিভে জল আসা কয়েক ধরনের মিষ্টি বা কেক, প্যাস্ট্রি বা প্যাটিজ বা স্যান্ডউইচ, এবং আঙুর, কলা বা কমলা, ঠাণ্ডা পানীয়, পছন্দমত চা বা কফি দিয়ে তাঁরা নিজেদেরকে ও আমাকে আপ্যায়ন করেছেন।

নিউ মার্কেট, গুলশান, তেজগাঁও বাজারে এমনকি অনেক পাড়ার মোড়ে মোড়ে সাজিয়ে রাখা ফলের দোকানগুলো দেখার মত। (আমি আজ ফলে এসিটাইলিন বা ফরমালিন ব্যবহারের আলোচনায় যাচ্ছি না)। চমৎকার করে সাজানো থাকে লাল-সবুজ রঙের বিশাল আকারের আপেল-বড়ই ও কুল-বড়ই, কমলা, আপেল, তরমুজ, শরিফা, বেল, নাশপাতি, বেদানা, কলা, ডাব, পেঁপে ইত্যাদি।

দাম নাগালের বাইরে বলে উচ্চবিত্তেরা আমার সময়ে আঙুর, আপেল, নাশপাতি ও বেদানা শুধু রোগীর পথ্য হিসেবেই কিনতে পারতো। এখন যে-কেউ তা কেনার সামর্থ্য রাখে। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আনু নামে একটি কাজের ছেলে আমাদের বাসায় থেকে মানুষ হয়েছিল। কয়েকমাস আগে সে মারা যাওয়ায়, ওর নিজ গ্রামে ওর পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করতে আমরা ভাইবোনেরা একটি দালান তুলে দিতে সাহায্য করেছি। পরিবারটিকে দেখতে গেলে তারা আমাদের আঙুর, কমলা, দুই রকমের মিষ্টি, কোক ও চা দিয়ে আপ্যায়ন করলো।

আরো একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। প্রতিবছর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের পরিবারের পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন একত্র হয়ে দোয়া পড়া ও গরিব-দুঃখী লোকজন ডেকে ভূরিভোজ করানো হয়। বত্রিশ বছর আগে এই অনুষ্ঠানের মেনুতে থাকতো একটি গরু জবাই করে পাওয়া মাংশ ঝাল দিয়ে রান্না করে, ডাল ও মোটা চালের ভাত। এবছর আমার ভাইবোনেরা দোয়া পড়ানো ও ভূরিভোজের দায়িত্বটি আমাদের বাড়িতে নির্মিত এতিমখানার পরিচালকদের হাতে দিয়ে দেন। এবারের খাওয়ার মেনুতে ছিল মিহি ও সুগন্ধি চালের পোলাও, গরুর মাংশের রেজালা, ডাল, সবজি, বোরহানি এবং ছোট ছোট প্লাস্টিকের কাপে আলাদাভাবে জমানো মিষ্টি দৈ। আমার ছোটোভাই জানালো আজকাল আগের মত ডাকলেই অভুক্ত লোক এসে হাজির হয় না। এবার তাই আমাদের অতিথি ছিল ধবধবে পোশাক পরা এতিমখানার শখানেক ছাত্র ও তাদের শিক্ষক।

চল্লিশ বছর আগে যেখানে সাত কোটি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের পেটের ভাত বিদেশ থেকে আনতে হতো, এখন পনের কোটি জনসংখ্যার সেই দেশটিই অধিক ফলনশীল চারা বপন করে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে! সবজি বিক্রয় করে লাভ বেশি হয় বলে অনেক কৃষকই ধানি জমিতে সবজি লাগাচ্ছে, ফলে বাজারে সবজির চালান আগের চাইতে অনেক, অনেক বেশি। আমাদের কৃষিবিদদের গবেষণার ফলে অধিক ফলনশীল শস্য, সবজি ও ফলের উৎপাদন আগের যেকোন সময়ের চাইতে এখন অনেক বেশি।

বেহেশতের কথা শুনেছি, সেখানে কারো কোন ফল খেতে ইচ্ছা করলে কষ্ট করে গাছ থেকে পেড়ে খেতে হবে না! ফলসহ গাছের ডালটি তার মুখের কাছে নেমে আসবে। এবার গিয়ে দেখতে পেলাম ছোটোছোটো আম, পেয়ারা, লিচু ও মিষ্টি-জলপাই গাছ তাদের ফল আমার মত মানুষের হাতের নাগালে ঝুলিয়ে রেখেছে! তেমন একটি গাছ থেকে পেয়ারা ছিঁড়ার সময় জান্নাতুল ফেরদৌস নাম্নী স্ত্রী আমায় সঙ্গ দিচ্ছিল, আর পেছনে দাঁড়িয়ে জান্নাতুল বাকিয়া নাম্নী শ্যালিকা আমাকে বাতাস করছিল। পরকালে বেহেশত যে আমার জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে এই পৃথিবীতেই হাতেনাতে তার প্রমাণ পেলাম! আমাদের কৃষিবিদরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই নশ্বর পৃথিবীতেই 'চিরস্থায়ী' বেহেশতকে নামিয়ে ফেলছেন!

এখন দিন ও যুগ বদলে গেছে। দোকানে হালির বদলে ডজন হিসাবে ডিম বিক্রয় হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন উপাচার্য জানালেন, বাংলাদেশ এখন হাঁস-মুরগি জাতীয় খাবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মিঠাপানিতে চাষ করে মৎস্য উৎপাদনে পৃথিবীতে অগ্রগামী হয়ে দেশটি সেই '৯৭ সালেই বিশ্বখাদ্য সংস্থার পুরস্কার লাভ করেছে। গরু-ছাগল উৎপাদনে সফলতা আসতে আরো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয়।

অনেকে বলবেন ফলন যেমন বেড়েছে, এখন মানুষের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তেমনি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এখন কঙ্কালসার লোকের চেহারা প্রায় দেখা যায় না। 'সেকালে' মেডিকেলের ছাত্ররা এনাটমি পরীক্ষায় মানুষের চেহারার দিকে তাকিয়েই চামড়ার নীচে কয়টি, কোথায় ও কি কি হাড় আছে তা লিখে ফেলতে পারতো! তার জন্য পড়াশোনা বিশেষ হয়তো করতে হতো না। আমাদের চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকের সিনেমাগুলো যদি আজ দেখেন, তখনকার নায়ক নায়িকার অনেককেই মনে হবে পুষ্টিহীনতার রোগী! অথচ আজ বা একালে আগের চেয়ে পুষ্টিকর ও অধিক খাবার খাওয়ার ফলে বাংলাদেশে অস্থিচর্মসার লোকের দেখা কদাচিৎ পাওয়া যায়! ফলে এখন ছাত্রদের বেশি পড়াশোনা করেই এনাটমি পরীক্ষায় পাশ করতে হয় বলে ধারণা করি!

আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন, ছোটোকালে দেখা অস্থিচর্মসার গৃহপালিত কৃষিপশুর স্বাস্থ্যের চেয়ে আজকের পশুর স্বাস্থ্য অনেক ভাল। শরৎচন্দ্রের 'গফুর' নামের গল্পটিতে অনাহারক্লিষ্ট কঙ্কালসার গরুটির কথা স্মরণ করুন!

আমাদের স্কুলের পাঠ্যবইতে লেখক 'সেকালের খাওয়া দাওয়া' বর্ণনা করতে গিয়ে যে মাত্র দুইজন খানসাহেব বা একটি খাসির কথা বলেছিলেন, তাদের স্বাস্থ্যের কথা জানতে তাই আজকে খুব ইচ্ছা হয়। তিনি যদি আজকের বাংলাদেশে একবার বেড়িয়ে আসতে পারতেন তবে সেই উপমাটি নিয়ে সেকালের খাওয়া দাওয়ার বাহাদুরি হয়তো করতেন না।

উন্নয়নের জন্য চাই
সর্বজনীন শিক্ষা